দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ আরবি ও ফারসি প্রীতি — পৃঃ ১২

চুকনগর হত্যাকাণ্ড শতাব্দীর বড় কলঙ্ক —পৃঃ ১৪

৭০ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।। ৬ ফাল্গুন - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com

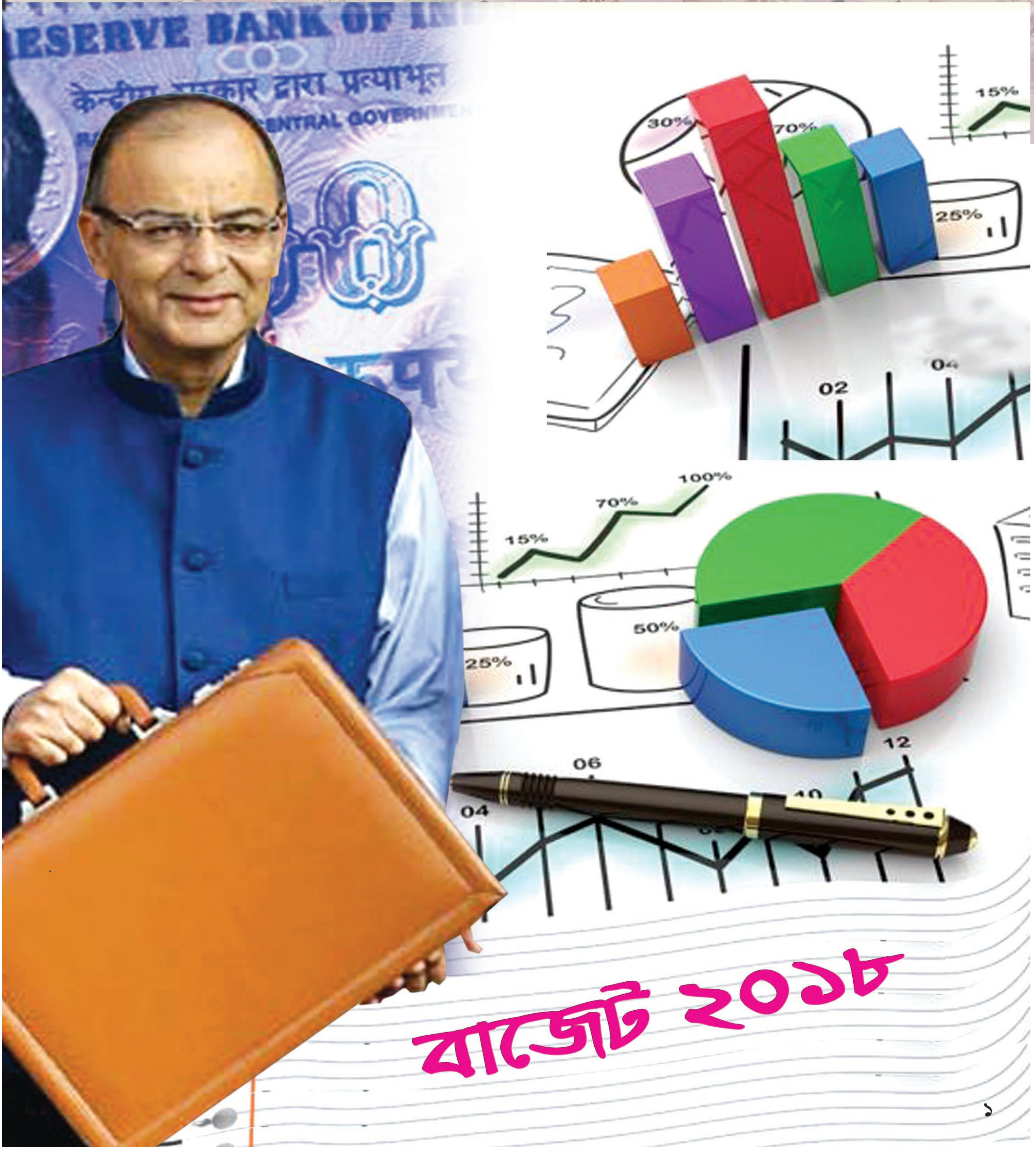

বাজেট ২০১৮

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ৬ ফাল্গুন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৯ ফেব্রুয়ারি - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

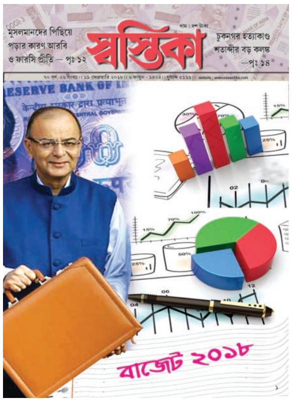

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ নীতিটি ভালো, তবে বাস্তব নয়
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : সবাই পাশ, ফেল শুধু শিক্ষা
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ আরবি এবং ফারসিপ্রীতি
▯ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

চুকনগর হত্যাকাণ্ড শতাব্দীর বড় কলঙ্ক
▯ মানস ঘোষ ▯ ১৪

বাঙালির জতুগৃহ নির্মাণের কাণ্ডারি বামপন্থীরা
▯ পুলক নারায়ণ ধর ▯ ২৭

বাজেট যুগপৎ সংস্কারমুখী ও সমব্যথী
▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ১৯

মোদীর হেলথ্ কেয়ার : নিম্নবিত্তের আশার আলো
▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ২১

এবারের বাজেটের অভিমুখ জনকল্যাণ
▯ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ▯ ২২

ভারতীয় ভাষায় লিখিত রত্নভাণ্ডারসম গ্রন্থরাজি বিশ্বের দরবারে পৌঁছানোর অধিকারী ▯ পবন কে ভার্মা ▯ ২৭

সূর্যোপাসনামূলক কুমারীব্রত মাঘমণ্ডল
▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত
▯ সলিল গেঁউলি ▯ ৩৩

সাক্ষাৎকার— নাগা সমস্যার আশু সমাধানের জন্য বিজেপি দায়বদ্ধ ▯ রামমাধব ▯ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০**
▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** ▯ **অন্যরকম : ৩৮**
▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দোল সাহিত্য সংখ্যা

দোল শীত এবং বসন্তের সন্ধিক্ষণের উৎসব। এই সময় প্রকৃতি শীতের ধূসরতাকে বিদায় জানিয়ে বসন্তের নতুন রঙে সেজে ওঠে। সেই রঙের ছোঁয়া লাগে মানুষের মনেও। তাই ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছে তার অন্তরের রং। দোলকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সাহিত্য। আঁকা হয়েছে ছবি। বাঁধা হয়েছে সুর। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যাতে তাই সাহিত্যের আয়োজন। বিশেষ দোল সাহিত্য সংখ্যা। থাকবে নির্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধ এবং গল্প। লিখবেন— ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. সুদীপ বসু, অভিজিত দাশগুপ্ত, শেখর সেনগুপ্ত, এষা দে, রমানাথ রায় প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারত 'সেকুলারিজম' শিখিতেছে

ভারতবর্ষে কিছু স্বঘোষিত 'বুদ্ধিজীবী' রহিয়াছেন। ইহাদের আবার কিছু স্বঘোষিত মুখপাত্র রহিয়াছে, যাহা মূলত বঙ্গ-কেন্দ্রিক। নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসিবার পর হইতে ইহারা দেশবাসীগণকে 'সেকুলারিজম' শিখাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন। ভারতবাসীকে তাঁহারা বোঝাইতেছেন দেশে সংখ্যালঘুদিগের অধিকার সুরক্ষিত করা সংখ্যাগুরুদেরই কর্তব্য। নহিলে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় 'সেকুলারিজমে'র আর মান থাকিতেছে না। ইহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া একদল সুকুমারমতি স্লোগান তুলিয়াছেন 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদি'; ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য, প্রতিটি জেলা, প্রতিটি শহর 'আজাদি' চাহিতেছে। সাতচল্লিশের দুই টুকরা (একাত্তর ধরিলে তিন টুকরা) ভারতবর্ষ 'সেকুলারিজমে'র বড়জোর এক আনা দেখিয়াছিল, এখন দেশটি টুকরা টুকরা করিতে না পারিলে আর 'সেকুলারিজমে'র ষোল কলা পূর্ণ হইবে কী করিয়া!

ইহার বাহ্য অভিব্যক্তি ইদানীং দেখা গিয়াছে মূলত দুইটি ঘটনায়। একদিকে অতি সম্প্রতি কাশ্মীরে লাগাতার পাক-হামলার ঘটনায় একাধিক সেনা-অফিসার ও জওয়ানের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে জম্মু-কাশ্মীরের বিজেপি বিধায়কগণ যখন 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' স্লোগান দিতেছিলেন, তখন বিরোধী ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিধায়ক আকবর লোন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়া বসেন। আকবর সাহেবের যুক্তিটি 'সেকুলারিজমে'র ধোপে যে বিলক্ষণ টিকিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কী! তাঁহার যুক্তি বিজেপি বিধায়কেরা 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' বলিলে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিবার অধিকার (ইহা মৌলিক না যৌগিক, গণতান্ত্রিক না অগণতান্ত্রিক তাহা গবেষণার বিষয়) তাহার অবশ্যই রহিয়াছে। বলাই বাহুল্য, ভারতবর্ষের 'বুদ্ধিজীবী'গণের 'সেকুলারিজমে'র শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে। এই যে নিরপেক্ষতা (ধর্ম না অধর্ম তাহা বুঝিতেও আমরা অসমর্থ) আকবর লোন দেখাইয়াছেন, তাহাতে 'সেকুলারিজমে'র বিষবৃক্ষটিকে স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য ভারতবাসী লাভ করিয়াছেন, 'বুদ্ধিজীবী'গণের শিক্ষা তাহাদের কৃতার্থ করিবে নিশ্চয়।

ইহারই দিন কতক পূর্বে জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মুফতি নাসির উল ইসলাম জানাইয়া দিয়াছিলেন ভারতবর্ষের মুসলমানদের উচিত পৃথক দেশের দাবি করা এবং ভারত অবৈধভাবে কাশ্মীর দখল করিয়া রহিয়াছে। আমরা প্রায়শই সাতচল্লিশের সহিত বর্তমান সময়ের তুলনা করিয়া দেশের পুনরায় পৃথকীকরণের আশঙ্কা করি। কিন্তু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিলে বোঝা যাইবে, দেশের মধ্যেই দেশের বিভাজন হইয়া রয়েছে। কেবল ভোট-লোলুপতায় সাম্প্রদায়িক তোষণে কংগ্রেস ও তাহার সহযোগীরা তাহাদের কর্তব্য শেষ করে নাই, মুসলমানদিগকে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক বানাইয়া, হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করিতে বৈদেশিক শক্তির ও শত্রুপক্ষের হাত ধরিতে এখন আর কুণ্ঠবোধ করিতেছে না।

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার তাহা প্রতিরোধ করিতেছে বলিয়াই, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দেশদ্রোহীরা এক ছাতার তলায় আসিয়াছে— হিন্দুদিগকে তাই এহেন আক্রমণের মুখে বারংবার পড়িতে হইবে আগামীদিনে, তাহার মানসিক প্রস্তুতি এখন হইতেই লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রস্তুতির পূর্বে উপলব্ধির প্রয়োজন। আর এস এসকে দলিত বিরোধী প্রমাণ করিতে ষড়যন্ত্রের বহুবিধ আয়োজন যে চলিতেছে, তাহা বোঝা যাইতেছে। ইহার মাধ্যমে দেশদ্রোহীরা কেবল যে দলিতদের সামাজিক মূলস্রোত হইতে দূরে ঠেলিতেছে তাহাই নহে, হিন্দুশক্তির ঐক্যকেও ব্যাহত করিতেছে। 'সেকুলারিজমে'র বিষবৃক্ষ হইতে নজর ঘুরাইতে বি এস এফের ডি জি-র সীমান্ত চেতনা মঞ্চের অনুষ্ঠানে যোগদান, আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের স্বয়ংসেবকদের দেশরক্ষায় ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য ইত্যাদিকে বিকৃত করিয়া শোরগোল যে সেই ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ, তাহা সত্বর উপলব্ধির প্রয়োজন রহিয়াছে; নহিলে 'সেকুলারিজম' নামক বিষবৃক্ষের ফল ফলিতে বিলম্ব হইবে না।

সুভাষিতম্

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।

পূজনীয়ো যথান্যায়ং সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।। (চাণক্য নীতি)

নীচ ব্যক্তিও যদি উত্তমবর্ণের গৃহে উপস্থিত হয়, তাহলে তাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করা উচিত। যেহেতু অতিথি সকলের কাছেই গুরুর মতো পূজনীয়।

সীমান্ত চেতনা মঞ্চ বিএসএফের ‘আই অ্যান্ড ইয়ার’-এর কাজ করছে : ডিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যে দুটি সমস্যা— গোরুপাচার ও অনুপ্রবেশ, তা ভারতের অন্য সীমান্তে নেই। উত্তর ২৪ পরগনায় গোপাচার রুখতে গিয়ে কর্তব্যরত বিএসএফ অফিসার দিলীপ মণ্ডলকে পাচারকারীরা গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করে এবং তা পুলিশের সামনেই। কেন এমন হলো— এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। এটা লজ্জার বিষয়। সন্দেহের কাঁটা নিহত ব্যক্তির দিকে যাওয়া উচিত হয়নি। এইজন্য দু’বার জিজ্ঞাসা করা হবে। ছাড়া হবে না। গত ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতার দধীচিভবনে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলে সতর্ক করে দেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। দেশের সীমান্তে ও অভ্যন্তরে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, জনভারসাম্যের পরিবর্তন ও তার প্রভাব, সন্ত্রাসবাদী ও অনুপ্রবেশকারীদের তৎপরতা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় মদত, নারী পাচার, মাদকদ্রব্য চোরাচালানের মতো বিষয়গুলি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষত সীমান্ত অঞ্চলে জনচেতনা জাগরণের কাজ করে চলেছে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ। এই উদ্দেশ্যেই কলকাতায় দু’দিন ব্যাপী মঞ্চের বৈঠকের আয়োজন। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যগুলি যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মেঘালয় ও মিজোরাম থেকে প্রতিনিধিরা এই চিন্তন বৈঠকে যোগ দেন।

এই বৈঠকেরই উদ্বোধনী অধিবেশনে রাজ্যপাল শ্রী রায় আরও বলেন, অসমে, বিশেষত এই রাজ্যের বরাক ঘাঁটিতে জনভারসাম্য বদল হলে দেশের পক্ষে তা মুশকিল হবে। ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত হবে। কেননা বরাকের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। এই বিপদ সম্পর্কে যতটা সচেতন হওয়া দরকার ছিল সেখানে ততটা হয়নি বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এই বৈঠকে বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংযোজক এ গোপালকৃষ্ণ এবং সর্বভারতীয় অন্য দু’জন অধিকারী— প্রদীপন ও মুরলীধরজী। গোপালকৃষ্ণন এরকম একটি কার্যক্রমের আয়োজনের জন্য স্থানীয় সকলকে স্বাগত জানান। মঞ্চের বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ড. জিষ্ণু বসু, সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, মোহিত রায়, কমলাকান্ত সাহরিয়া প্রমুখ।

‘ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত’ ছিল এই চিন্তন বৈঠকের মূল আলোচ্য। তাই বিএসএফের ডাইরেক্টর জেনারেল কে কে শর্মার উপস্থিতি প্রতিনিধিদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তিনি সীমান্ত এলাকার অবস্থা তুলে ধরেন। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে চেতনা মঞ্চের কাজের প্রশংসা করে বলেন, বাহিনীর ‘Eye and Ear’-এর কাজ করেন আপনারা। দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে বিএসএফের কিছু কর্মীর ভূমিকা সন্দেহজনক— প্রতিনিধিদের এই অভিযোগের জবাবে ডিজি বলেন, তাঁর বাহিনীর সবাই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ৬টি জেলার বেশ কয়েকটি ব্লকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে গত বছর পি চিদাম্বরমের নেতৃত্বাধীন সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল। এই রিপোর্টটি নিয়ে প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু। উপস্থিত প্রতিনিধিরা সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনবিন্যাসের চরিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে শাসকদলের নেতাদের পরোক্ষ মদতের অভিযোগ তারা জানান।

চেতনা মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সংগঠন সম্পাদক জগন্নাথ সেনাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানান।

কালিয়াচকে নগরসংকীর্তনে পুলিশের বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মালদা জেলার কালিয়াচক কি পশ্চিমবাংলায়? হিন্দুরা কি তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে পারবে না? গত ৯ ফেব্রুয়ারি কালিয়াচকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ (ইসকন)-এর উদ্যোগে এক হরিনাম সংকীর্তনের শোভাযাত্রায় পুলিশের বাধা দানের ঘটনায় এমনই প্রশ্ন কালিয়াচকের হিন্দু জনসাধারণের।

সেদিন কালিয়াচকের আলিপুরে ইসকনের উদ্যোগে ভাগবৎ পাঠের আয়োজন করেন গ্রামবাসী। নিয়ম অনুযায়ী ভাগবৎ পাঠের আগে হরিনাম সহকারে নগরসংকীর্তন করার রীতি। সেই মতো মায়াপুর ও রাশিয়া থেকে আগত লীলাহরি প্রভু-সহ কয়েকজন সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে বিকেল ৩.৩০ মিনিটে নগরসংকীর্তন আলিপুর, বালিয়াডাঙ্গা পরিক্রমা করে ফেরার সময় কালিয়াচক থানার সামনে পুলিশ সংকীর্তনকারীদের পথরোধ করে। আই সি সুমন ব্যানার্জির

বক্তব্য, বড় রাস্তা দিয়ে সংকীর্তন নিয়ে যাওয়া যাবে না। উদ্যোক্তারা এর কারণ জানতে চাইলে আই সি-র নির্দেশে মাইক-সহ কয়েকজনকে থানায় আটক করা হয় এবং ভক্তমণ্ডলীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। অগত্যা সংকীর্তন বন্ধ করে সবাই আলিপুরে ফিরে আসেন। বেশ কিছু সময় থানায় বসিয়ে রেখে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। দুদিন আগে সংকীর্তনের অনুমতি চাইতে গেলে আই সি বলেন— কালিয়াচকে সংকীর্তন করার প্রয়োজন নেই, মায়াপুরে গিয়ে করুন।

এই ঘটনায় কালিয়াচক এলাকার হিন্দু জনসাধারণের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়। স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ, ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থেই বর্তমান শাসকদলের নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন হিন্দুদের প্রতি এরকম ব্যবহার করছে। এর আগে গত বছর শাসকদলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী জেহাদি শক্তি থানা আক্রমণ করে থানার নথিপত্র জ্বালিয়ে দিয়ে বালিয়াডাঙ্গার এক যুবককে গুলিবিদ্ধ করে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক ভিত্তিহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের সাম্প্রতিক একটি মন্তব্য নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একযোগে তরজায় মেতে উঠেছে। তাদের বক্তব্য, সেনাবাহিনীর সঙ্গে স্বয়ংসেবকদের তুলনা করে সরসঙ্ঘচালক সেনাকে অপমান করেছেন। তাদের অভিযোগ, সেনাকে ছোট দেখানোর পিছনে রয়েছে সঙ্ঘের গৈরিকীকরণের পুরনো ষড়যন্ত্র। বিতর্ক এবং সারবত্তাহীন অভিযোগের জবাবে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ মনমোহন বৈদ্য বলেন, সরসঙ্ঘচালক ঘুনাক্ষরেও সেনা এবং স্বয়ংসেবকের তুলনা করেননি। তিনি তুলনা করেছেন সাধারণ নাগরিক সমাজ এবং স্বয়ংসেবকদের মধ্যে। তাঁর কথায়, 'ভগবতজী বলেছেন একজন স্বয়ংসেবককে সৈনিকের শৃঙ্খলা শেখানেও হয়। তাহলে এর মধ্যে তুলনা করার কথা উঠছে কেন?' মনমোহন বৈদ্য আরও বলেন, 'অতীতের প্রতিটি যুদ্ধে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মিলিটারিও নয়, প্যারামিলিটারিও নয়। এটা একটা পারিবারিক সংগঠন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরসঙ্ঘচালক মন্তব্য করার পরেই তার কথা বিকৃত করে মাঠে নেমে পড়ে কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিএম এবং সমাজবাদী পার্টি। সারা দেশে রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে বসা কংগ্রেস হাস্যকর সব অভিযোগ করে হাওয়া গরম করার চেষ্টা করে। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে জবাব দেবার পর অবশ্য কেউ পাল্টা কিছু বলেননি।

জওয়ান স্বামী সংঘর্ষে মৃত, ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে স্ত্রী সেনাবাহিনীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০১৫-য় কাশ্মীরের বারামুল্লায় সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছিলেন গোর্খা রাইফেলস-৩২-এর এক তরতাজা যুবক। নাম শিশির মল্ল। বীরের মতো দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। মারা যাবার আগে এক জঙ্গিকে নিহত, অপরজনকে আহত করে যান তিনি। সেদিন মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েছিল তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা মল্লের। এই ঘটনার মাস ছ'য়েক আগেই তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর শ্বশুরমশাইকে। তিনিও ছিলেন সেনাবাহিনীর সুবেদার-মেজর।

শিশির মল্ল ও সঙ্গীতা মল্ল (ফাইল চিত্র)

পেশায় ব্যাঙ্ককর্মী সঙ্গীতার জীবনে আর্থিক অভাব হয়তো সেভাবে ছিল না, কিন্তু মানসিক শান্তি তিনি খুঁজে পাননি। জীবনের মোড় ঘোরালো ২০১৭-র একটি ঘটনা। গত বছরের সেপ্টেম্বর রানিক্ষেতে সেনার একটি অনুষ্ঠানে প্রয়াত স্বামী শিশির মল্লের হয়ে পুরস্কার আনতে যান সঙ্গীতা। স্বামীর সম্মান স্ত্রীকে এতটাই গর্বিত করে যে ব্যাঙ্কের নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে সেনাবাহিনীর বিপদসঙ্কুল জীবন বেছে নিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। দেরাদুনের এই বীরাঙ্গনা অবশেষে শর্ট সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা উতরে মার্চের শেষে চেন্নাইয়ে সেনা-অফিসার ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে যোগ দিতে চলেছেন।

স্বামীর মৃত্যু আপনাকে সেনাবাহিনীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলেনি? গর্বিতা স্ত্রী জানালেন— সে প্রশ্ন তো ওঠেই না, বরং দেশের কাজে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পেরে তিনি গর্ব অনুভব করছেন। কারণ ব্যাঙ্কের কাজের চেয়ে সেনাবাহিনীর কাজকে তিনি অধিক গর্বের মনে করেন। জে এন ইউয়ের এক দেশদ্রোহী সম্প্রতি মন্তব্য করেছে--- মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে যারা টেনেটুনে পাশ করে তারাই নাকি সেনাবাহিনীতে নাম লেখায়। আর কলকাতার একটি দেশদ্রোহী সংবাদপত্রের উত্তর-সম্পাদকীয়তেও 'দেশপ্রেমের দিনমজুর' ইত্যাদি চটুল বাক্য লিখে ভারতীয় সেনাদের অপমান করেছিল। সঙ্গীতার দৃষ্টান্ত এই দেশদ্রোহীদের দেখাল যতই ষড়যন্ত্র হোক দেশপ্রেমের প্রকাশ দেশবাসীর মধ্যে আজও রয়েছে, দু-চারটে দেশদ্রোহী কী বলল, কী লিখল তাতে দেশবাসীর মাথাব্যথা নেই। কেবল ওই অপোগণ্ডগুলোকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা ছাড়া।

চীনের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে উদ্বেগ ট্রাম্প প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে চীন তার প্রতিবেশি দেশগুলির ওপর দমন-পীড়ন চালাতে চাইছে। ২০১৯ অর্থবর্ষের (১ অক্টোবর, ২০১৮- ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করার সময় ট্রাম্প প্রশাসন এমন উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো প্রতিবেদন পেশ করল মার্কিন কংগ্রেসে। পেন্টাগন তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে চীন তার সেনা-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বাড়িয়ে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে চাইছে। এর ফলে আমেরিকা-চীন সেনা সম্পর্কে যে স্বচ্ছতা ও অনাক্রমণাত্মক ভাব রয়েছে, তা ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে মার্কিন সরকার। রিপোর্টে এই আশঙ্কাও করা হয়েছে যে চীন ও রাশিয়া বিশ্বের অন্য দেশগুলির অর্থনীতি, কূটনীতি ও নিরাপত্তা-ব্যবস্থার ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে চাইছে। ট্রাম্প প্রশাসনের রিপোর্ট একইভাবে বিঁধেছে রাশিয়াকেও। তাদের অভিযোগ, নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের কর্মসূচিকে স্তব্ধ করে দিয়ে ইউরোপীয় ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির সরকারি, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে ওই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর রাশ কায়েম করতে চায় রাশিয়া।

পেন্টাগনের রিপোর্টে উত্তর কোরিয়া ও ইরাককে নিয়েও উদ্বেগ ধরা পড়েছে। বলা হয়েছে যে এই দু'টি দেশ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অশান্তি ছড়াতে চেষ্টা করছে পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে। উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক, জৈবিক, রাসায়নিক, প্রথাগত ও অপ্রথাগত অস্ত্র এবং ব্যালেস্টিক মিসাইল প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও আমেরিকাকে দমনের চেষ্টা করছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের একাধিপত্য কায়েমের চেষ্টা নিয়েও উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। সবশেষে চীন রাশিয়ার সঙ্গে যুঝতে আমেরিকাকে নতুন ও অভিনব পন্থার সন্ধান করতে হবে বলে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কূটনীতিকরা মনে করেন ভারত চীনের সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী এবং সন্ত্রাসে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে একাধিকবার বিশ্বের মঞ্চে যেভাবে সরব হয়েছে, মার্কিন প্রশাসনের রিপোর্ট তাকেই সমর্থন করল।

আই আই টি-খড়্গপুরের মৌখিক ইতিহাসচর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দু’ বছর ধরে গবেষণা করার পর আই আই টি খড়্গপুরের কলাবিভাগ দেশভাগের মৌখিক ইতিহাস সম্পর্কিত তাদের সংগ্রহ সাধারণ মানুষের গোচরে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মৌখিক ইতিহাস প্রচলিত ইতিহাসের থেকে অনেকটাই আলাদা। অতীতের কোনও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংগৃহীত হয় মৌখিক ইতিহাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন পাঠক্রমে যে ইতিহাস পড়ানো হয় সেখানে সাধারণ মানুষের ভূমিকা নগণ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অভিমত প্রচলিত ইতিহাস অবহেলা করে।

অথচ প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শুনলে ইতিহাস অনেক মানবিক হয়ে উঠতে পারে। কলাবিভাগের অধ্যাপক এবং এই প্রকল্পের গবেষক অঞ্জলি জেরা রায় বলেন, ‘হামির সিংহের কথাই ধরুন। তাঁকে পাক-আফগান সীমান্তের ছোট্ট গ্রাম জালালাবাদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ তিনি বলেছিলেন, জালালাবাদের লোকেরা নেহরুর নাম শোনেনি। তারা নেতা হিসেবে মানত শুধু জিন্নাহ্‌কে। নেহরু একবার জালালাবাদে গিয়ে সেখানকার হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারা পাকিস্তানে থাকতে চায় নাকি হিন্দুস্থানে? বেশিরভাগই বলেছিল পাকিস্তানে।’ কলাবিভাগের গবেষকেরা দেশভাগের শিকার ২০০ জনের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের রেকর্ডেড বক্তব্য ঠাঁই পেয়েছে সংগ্রহশালায়।

উবাচ

“ভারতীয় সংস্কৃতি পুরাতন কিন্তু চিরন্তন। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা এই সংস্কৃতি প্রতিদিনই নতুনত্ব লাভ করে।”

ড. বালমুকুন্দ পাণ্ডে
ইতিহাসবিদ

মাকাইয়াস-আই সি এইচ আর-এর গুয়াহাটির সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে

“আবুধাবির মন্দির নিঃসন্দেহে স্থাপত্যের দিক দিয়ে আধুনিক হবে, সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’-এর বার্তাও তুলে ধরবে বিশ্ববাসীর কাছে।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

আবুধাবিতে শিবমন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাষণে

“সীমান্ত চেতনা মঞ্চের অনুষ্ঠানে বিএসএফের ডিজি এসেছেন শুনে চিন্তা বেড়েছে দিদির। গোরুপাচার বন্ধ হলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের টাকা আসবে কোথা থেকে?”

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি

সীমান্ত চেতনা মঞ্চে ডি জি-র উপস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উষ্মা প্রসঙ্গে

“গোয়েন্দা সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি সীমান্তের ওপারের মদতে সুনজুয়ান সেনাশিবিরে জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছে। স্থানীয় লোকজনও যে তাদের সাহায্য করেছে সে প্রমাণও আমরা পেয়েছি। এই জঘন্য কাজের জন্য পাকিস্তানকে চড়া দাম দিতে হবে।”

নির্মলা সীতারামন
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী

সুনজুয়ান সেনাশিবিরে জঙ্গিহামলা প্রসঙ্গে

এক দেশ, এক নির্বাচন নীতিটি ভালো, তবে বাস্তব নয়

গূঢ় পুরুষের

কলম

আমাদের এই বিশাল দেশে প্রতি বছরেই কোনও না কোনও রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন লেগেই থাকে। এর ফলে, নির্বাচন বাবদ বিপুল খরচ হয়ে থাকে। এই খরচ অনুৎপাদক বা আনপ্রোডাক্টিভ। এই খরচে কোনও উন্নয়ন হয় না। সম্পদ সৃষ্টি হয় না। স্রেফ জনগণের টাকা নর্দমায় ঢালা হয়। ভারতের মতো গরিব দেশে এটা বিলাসিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। একটা রাজ্যের নির্বাচনের অর্থ কয়েক হাজার কোটি টাকার অপচয়। সব রাজনৈতিক দলই তাদের প্রভাব মতো শিল্পপতিদের কাছ থেকে গোপনে টাকা নেয়। দেশের আইনে দু' হাজার টাকার বেশি চাঁদা নিলে তা চেকের মাধ্যমে নিতে হবে। সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে চাঁদাটা কে বা কোন বাণিজ্য সংস্থা দিয়েছে। তাছাড়া নির্বাচনের প্রার্থীদেরও জানাতে হয় তাঁর ভোটের প্রচার খরচের সূত্রটা কী? নির্বাচন কমিশন ভোটের খরচ বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু কমিশন নির্দিষ্ট ভোটের খরচ দেশের এক শতাংশ প্রার্থীও মানেন না। এই তথ্যটা কমিশনেরও জানা আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও প্রার্থীকে নিয়ম ভাঙার জন্য শাস্তি পেতে দেখিনি।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়। যদি সারা দেশে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ব্যবস্থা চালু করা যেত তবে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীদের খরচ এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের সরকারি খরচ সবই কমে অর্ধেক হয়ে যেত। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মিজোরামে ভোট হওয়ার কথা চলতি বছরের শেষে অথবা মাঝামাঝি সময়ে। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড বিধানসভার ভোটাভুটি হবে লোকসভার ভোটের ছয় মাসের মধ্যে। লোকসভার ভোটের বিপুল আয়োজনের পর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আবার বিধানসভার ভোটের সুব্যবস্থা করতে যে বিপুল খরচ ও শ্রম নষ্ট হবে তার কি সত্যি প্রয়োজন আছে? রাজনৈতিক দলগুলিরও তাদের দলীয় প্রার্থীদের জেতাতে অল্প কয়েক মাসের তফাতে দু' দু'বার বিপুল ব্যয় করাটাও কতটা বাস্তব সম্মত?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চাইছেন লোকসভা এবং বিধানসভার ভোট একসঙ্গে হোক। এই কাজটি করতে গেলে কিছু রাজ্যে বিধানসভার ভোট এগিয়ে আনতে হবে এবং কিছু রাজ্যে ভোট পিছিয়ে দিতে হবে। দেশের সংহতি ও ঐক্যের জন্য 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নীতিটি নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু কিছু সাংবিধানিক বাধা আছে। যেমন, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং মিজোরামে চলতি বছরেই (২০১৮) বিধানসভার ভোট করতে হবে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় এইসব রাজ্যে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভোট করতে হবে। বিকল্প, রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করা। সেটা সম্ভব নয়। কারণ, সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করা যায়। সেখানে এক দেশ, এক নির্বাচন কথাটি নেই। দ্বিতীয় বিকল্প, সব স্বীকৃত রাজনৈতিক দল একমত হয়ে সংসদে আইন পাশ করে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' চালু করতে পারে। চোখ বন্ধ করে বলা যায় যে এই প্রস্তাবে কংগ্রেস এবং তৃণমূল নেত্রী মোটেই রাজি হবেন না। সেক্ষেত্রে বিরোধী দলের সাংসদরা রাজ্যসভায় প্রস্তাবটি আটকে দেবেন। রাজ্যসভায় বিজেপির গরিষ্ঠতা নেই। তাছাড়া পশ্চিবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা ২০২১ সালে। সেক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার দু' বছর আগে নির্বাচন করতে মোটেই রাজি হবেন না তৃণমূল নেত্রী। তাই আগামী বছর লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে দেশজুড়ে বিধানসভার নির্বাচন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তব করতে হলে লোকসভার ভোটে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরতে হবে। তখন রাজ্যসভায় সরকারি বিল আটকে দিতে পারবে না বিরোধীরা। নির্বাচনের নামে অর্থের অপচয় বন্ধ হবে। কর্মনাশা দিনের সংখ্যা কমবে। কালোটাকার রমরমা কমবে। গণতন্ত্রের নামে দুর্বৃত্তদের তাণ্ডবলীলা বরদাস্ত করতে হবে না। সেই শুভ সময়ের অপেক্ষায় রইলাম। ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

**বার্ষিক সডাক গ্রাহক
মূল্য ৪০০্ টাকা
প্রতি কপি ১০্ টাকা**

সবাই পাশ, ফেল শুধু শিক্ষা

মাননীয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

আপনাকে অভিনন্দন। সবাইকে পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন। আমি দিদির ভক্ত, তাই ঠিক করেছিলাম ভাইপোকে সরকারি স্কুলে পড়াব। এমনিতে তো পাশ-ফেল নেই প্রাথমিকে। তার উপরে দিদিভাই বলেছেন, কোনও পড়ুয়া খারাপ ফল করলে স্কুলের শিক্ষকরা ছুটির পরে পড়াবেন। দুপুরে মিড-ডে মিল নয়, ওই সিরিয়াস লেখাপড়া হবে ভেবেই ভাইপোকে দিয়েছিলাম সরকারি স্কুলে। এক সময়ে সেই স্কুলে আমিও পড়েছি।

কিন্তু ছাড়িয়ে নিলাম। বেসরকারি স্কুলে টাকা দিয়ে ভর্তি করাতেই হলো। কারণ, ছুটিতে পড়ানোর ভয়ে টিচাররা দারুণ বুদ্ধি লাগিয়েছেন। পরীক্ষার সময়ে ব্ল্যাক বোর্ডে উত্তর লিখে দিয়েছেন। সবাই টুকেছে। সবাই পাশ করেছে। শীতের ছুটিতে টিচাররা দলবেঁধে রাজগীর ঘুরতে গিয়েছেন।

ভাইপোর নয় স্কুল বদলে দিলাম। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা হলো তা দেখে আপনাকে, সরি, আপনার নেত্রী আমার দিদিভাইকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। সবাই পাশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের রাতারাতি পাশ করিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সত্যিই ঐতিহাসিক। এ বার স্নাতক পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় কলা বিভাগে ৫৭.৫০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছেন। বিজ্ঞানে পাশের হার কমেছে ১০ শতাংশ। কিন্তু পরে এক নির্দেশে সবাই পাশ করে গিয়েছে। ফেলুরা বলল, পাশ না করালে দেখে নেব। দিদি বললেন, পার্থদা ব্যাপারটা দেখে নিন। আপনি বললেন, উপাচার্য ব্যাপারটা দেখে নিন। ব্যাস নিয়ম বদলে গেল। সবাই পাশ।

সত্যি তো, আগেকার দিনে কত হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী কোনও বিষয়ে 'ব্যাক' পেয়ে পরিবার ও সমাজের গঞ্জনা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে বছরের পর বছর! কেউ লেখাপড়াই ছেড়ে দিয়েছে। এমন সুখের দিন কেন আগে আসেনি। পাশ না করেও পাশ করার এমন দিনকেই তো 'পরিবর্তন' বলে।

একেই বলে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মমতা। ফেল করে কয়েকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় চারটে লাথি মারল, আর ব্যস, ড্যাং ড্যাং করে নতুন মার্কশিট নিয়ে বাড়ি চলে গেল। ফেল করা বিষয়ে পরে পাশ করে নিলেই চলবে। বিশ্ববিদ্যালয় বলল, নিয়ম বদলের জন্য ফেল করেছে। নিয়ম বদলে ওরা পাশ। প্রথম প্রশ্ন, নিয়ম বদল হয়েছিল কেন? যদি প্রয়োজনে বদল হয়ে থাকে তবে সেটা আবার বদলে গেল কেন?

আসলে নতুন নিয়মের কারণে তো এই ছাত্র-ছাত্রীরা ফেল করেনি। ফেল করেছে পড়াশোনা করেনি বলে। পরীক্ষায় প্রশ্নের ঠিক মতো উত্তর দিতে পারেনি বলে। কিন্তু এই সরল সত্যটা না তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, না রাজনীতির কারবারিরা, কেউই জোর গলায় বলতে পারলেন না।

যারা নতুন নিয়মে পাশ করতে পারেনি, তাদের বেশিরভাগ তো আসলে পাশ করতেই চায়নি। ধরেই নিয়েছিল, পাশ না করলেও চলবে। ধরে নেওয়াই যায়, ফেল করা অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সেই মতো পাশ বিষয়ের পরীক্ষার জন্য ভালো করে পড়াশোনাই করেনি। পরে পুরোটা দেখে নেওয়া যাবে বলে ধরে নিয়েছিল।

বিরোধীরা বলছে, এতদিন স্কুল, কলেজে বিক্ষোভ-ঘেরাও করলেই ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেওয়ার নজির ছিল। এবার তো বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেও নিয়ম বদলে ফেলা যায়।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের মদত দিতে এলেন কে? স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী! লজ্জা লজ্জা মুখ করে দলেরই ছাত্র-যুবদের সভা থেকে শিক্ষামন্ত্রীকে বললেন যে, তাঁর এটা বলা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী যেন বিষয়টি একটু দেখেন।

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পড়ুয়াদের উদ্দেশে 'পড়াশোনায় মন দিতে' বললেন বটে, তবে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কে 'আবেদন' জানালেন নিয়ম প্রত্যাহারের।

ব্যাস, রাখে দিদি মারে কে? আমরা সবাই পাশ আমাদের এই দিদির রাজত্বে।

—সুন্দর মৌলিক

মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ আরবি এবং ফারসিপ্রীতি

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

শ্রদ্ধেয় কুলদীপ নায়ারের একটা প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীপবিত্র রায় মহাশয়ের চিঠি পড়ে খুব ভাল লাগলো, যদিও তাঁর কিছু কথা অনেকেরই পছন্দ হবে না। কিন্তু সত্যিটা সত্যিই— সেটা যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন।

প্রথমত, শ্রীনায়ার প্রশ্ন তুলেছিলেন হিন্দু প্রতিষ্ঠানে মুসলমানরা তেমন চাকরি পান না কেন? কেউ কেউ এর যথার্থ উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টা আর একটু স্পষ্ট করা দরকার। এটা আদৌ ধর্মীয় বিদ্বেষের ব্যাপার নয়, এর পেছনে আছে একটা মর্মান্তিক ভুলের ইতিহাস।

ব্রিটিশ যুগে যখন এই দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়, তখন রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষী বুঝেছিলেন, এতে এই দেশের মানুষের অশেষ উপকার হবে— বিদেশের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। মনের দিগন্ত প্রসারিত হবে, ঘটবে আধুনিকতার সঙ্গে অবাধ সংযোজন। সেই কারণে হিন্দুরা সাগ্রহে সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। ড. নিমাইসাধন বসু মন্তব্য করেছেন, ব্রিটিশরা মুসলমান শাসন ধ্বংস করেই এই দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেই কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাতে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজি বিরোধিতাও। তাঁর ভাষায়— 'The introduction of secular English education and the replacement of the Persian by the English language naturally hurt their pride. The Muslims suffered from a sense of humiliation which caused their indifference --- (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভ্‌মেন্ট, পৃ. ২৯)। তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করে আরবি ফার্সি নিয়েই থেকেছেন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়ে গেছে সম্পূর্ণ অধরা। অনুরূপভাবে চন্দ্র ত্রিপাঠী দে জানিয়েছেন, 'Consequently, modern Western thought did not spread among Muslim intellectuals who remained traditionally backward'— (ফ্রিডম স্ট্রাগল, পৃ. ১০৪)। অনেক পরে অবশ্য স্যার সৈয়দ আহমেদ, বদরুদ্দীন তায়েবজী প্রমুখ অভিজ্ঞ ব্যক্তির চেষ্টায় ভুলটা সংশোধিত হয়েছে কিছু পরিমাণে। কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ফার্সি, মাদ্রাসা ইত্যাদির দ্বারা সুশিক্ষিত হিন্দুদের সঙ্গে আর শিক্ষালয় ও চাকরির পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়নি। সেটা সম্ভবও নয়। তাছাড়া এটাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন সময় এই সম্প্রদায়ের বহু মানুষ ধরা পড়েছে নাশকতা, হত্যালীলা ও গুপ্তচরবৃত্তির জন্য। অল্প কিছু উগ্রপন্থীর জন্য অন্যরাও বিশ্বাস হারিয়েছেন। চাকরির সুযোগও কমেছে।

মেকি 'প্রগতিশীলরা' উগ্র সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির চেয়েও বেশি সঙ্কীর্ণচিত্ত ও ভয়াবহ প্রাণী। তাঁরা প্রগতিশীল সাজার জন্য প্রকাশ্যে গোমাংস খান এবং বিদ্যা জাহির করার জন্য বলেন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে গোমাংস খাওয়ার বিধান আছে এবং মুনিঋষিরাও সেটা খেতেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি মেকি সেকুলারবাদীদের কাছে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন, এখনও এক ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রচিত হয়নি কেন? আমাদের সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে আছে— 'The state shall endeavour to secure for the citizens uniform civil code througout the territory of India। ধর্ম হবে বিভিন্ন ধরনের, কিন্তু দেওয়ানি আইন হবে একই ধরনের। তাহলে মুসলমানদের বিবাদ, বিবাহ-বিচ্ছেদ (তালাক), নারীর জন্য উত্তরাধিকার ইত্যাদি শরিয়তি নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কেন? সংবিধান রচনার পর প্রায় সত্তর বছর কেটে গেছে, তবু কেন এতদিনেও এই সব নিয়ে আইন রচিত হয়নি? যদিও তাৎক্ষণিক তিন তালাক রোধে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে এই সরকার।

তার উত্তর একটাই— ওই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ও নাগরিকরা রাষ্ট্রে থাকেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের ঊর্ধ্বে বাস করেন— তাঁদের নিয়ন্ত্রিত করে শরিয়তি আইন। দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন— সেকুলার রাষ্ট্র ঈশ্বর ও ব্যক্তির ব্যাপারটা ছেড়ে দেয়; আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে শুধু ব্যক্তি ও ব্যক্তির সম্পর্ককে --- (ইনট্রোডাকশান টু দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১০৩)। কিন্তু বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি তো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ব্যাপার। তাহলে রাষ্ট্রীয় আইন সেগুলোকে ছুঁতে পারবে না কেন?

এটা লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট', 'স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট',

'পার্শি ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স অ্যাক্ট', ইত্যাদি প্রণয়ন করেছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও বিধি রচনা করেনি তাঁদের তীব্র আপত্তির কারণে। তাঁদের অনেকে বরং ৪৪ নং অনুচ্ছেদকে বাতিল করার জন্য জোরালো দাবি তুলেছেন।

শাহবানু বনাম আমেদ শাহের মামলায় (১৯৮৫) সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় মন্তব্য করেছিলেন, এই ব্যাপারে সরকারকে তার কর্তব্য পালন করতেই হবে, কারণ এটা সংবিধানের নির্দেশ। তাছাড়া এতে জাতীয় ঐক্যও সূচিত হবে— 'A common civil code will help the cause of national integration। আর জর্ডন ডিয়েংগদে বনাম চোপরার মামলায় (১৯৮৫) এই আদালত জানিয়েছিল 'the time has come for the intervention of the legislature in these matters to provide for a uniform code।' আরও মনে রাখতে হবে, সরলা মুদ্গল বনাম কেন্দ্রের মামলায় (১৯৯৫) বিচারপতি কুলদীপ সিংহ জানিয়েছিলেন— 'no community can oppose the introduction of uniform civil code for all the citizens।'

কিন্তু সাতটা দশক অতিক্রান্ত হলেও কোনও কেন্দ্রীয় সরকারই এই ব্যাপারেও উদ্যোগ নেয়নি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিরোধের ভয়ে। বরং রাজীব গান্ধীর সরকার শাহবানু মামলার রায়কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৮৬ সালে 'মুসলিম উওমেন (প্রোটেক্শন অব রাইটস্ অন্ ডিভোর্স) অ্যাক্ট' পাশ করেছিল— (কালিদাস বসু— ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড জুডিশিয়াল প্রনাউন্সমেণ্টস, পৃ. ৫০)। এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি এখনও চলছে, কারণ ওই সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ চায় পৃথক অস্তিত্ব।

ড. কে. এম. মুন্সি মন্তব্য করেছিলেন, স্বাধীনোত্তর ভারতে মুসলমানদের একটা সমস্যা দেখা দেবে, কারণ তাঁদের অনেকে দেশের মূল স্রোতে না ভিড়ে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইবেন— (অখণ্ড হিন্দুস্থান, পৃ. ৯৬)। ঠিক সেটাই কিন্তু ঘটেছে। তাই সৃষ্টি হয়নি ভারত-চেতনা। তাঁদের কাছে আগে ধর্ম— পরে জাতীয়তাবোধ। তাই ড. জে. সি. জোহারি লিখেছেন, 'The orthodox school of the Muslim community makes out a powerful case against Nationalism, Secularism and Democracy as all repugnant to Islam'— (ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ২৮)। কথাটা সর্বাংশে ঠিক। ড. হরিহর দাস লিখেছেন, এই কারণে ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মিশর প্রভৃতি দেশে শরিয়ত ও ব্যক্তিগত আইনকে সংশোধিত ও আধুনিক করা হয়েছে। —'the vested interests among the Indian Muslims are guided by mediavalism'--- (ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ.৪০১)।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু স্বার্থপর হিন্দু নেতা ও স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী। গোধরায় ৫৯ জন করসেবককে পুড়িয়ে মারা হলো ট্রেনের কামরায়। কেন্দ্র তদন্ত কমিটি বসিয়েছিল, অতি আগ্রহে তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব আরেকটা কমিশন বসিয়েছিলেন কেন? এই রাজ্যের প্রগতিশীল সরকার একটা ছোট্ট আন্দোলন দেখে তসলিমা নাসরিনকে তাড়াল কেন? কেন মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, দেশের সম্পদের ওপর মুসলমানদেরই প্রথম দাবি? কেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নির্বাচনে ওপার থেকে এসে অনেকে ভোট দেয়? অসম ক্রমে কেন মুসলমান-অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হচ্ছে? অযোধ্যার রামমন্দির ভেঙে বাবর কেন মসজিদ তৈরি করেছিলেন? ---(ড. মানবনাথ রায় চৌধুরী— ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯)। তাতে নমাজও পড়া হতো না--- তার ওপরের অংশ বিজেপির উদ্যোগে ভাঙা হলে চারটে রাজ্য থেকেই তাদের সরকারকে উচ্ছেদ করা হলো কেন?

তাহলে সেকুলারিজমের অর্থ কী? ড. এস. এল. সিক্রি মন্তব্য করেছেন, 'A Hindu is to-day accepted as secular only if he is promoslem, and perhaps, pro-other minorities'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৯২)।

এবার আমাদের বিসর্জন দিতে হবে নিজের ধর্মকে? একবার এক বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল— 'অতএব সেকুলারিজমের ওপর দাঁড়াইয়া হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে।'

চিঠিপত্র বিভাগে একটা লেখার মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলাম— সম্পাদক-মশায় 'সেকুলারিজম' ও 'হিন্দুত্ব' শব্দদুটির অর্থ জানেন কিনা। তাহলে কি 'সেকুলারিজম' ও 'হিন্দুত্ব' পরস্পর বিরোধী ধারণা?

বলা বাহুল্য, লেখাটি ছাপা হয়নি। আসলে, এই সব মেকি 'প্রগতিশীলরা' উগ্র সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির চেয়েও বেশি সঙ্কীর্ণচিত্ত ও ভয়াবহ প্রাণী। তাঁরা প্রগতিশীল সাজার জন্য প্রকাশ্যে গোমাংস খান এবং বিদ্যা জাহির করার জন্য বলেন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে গোমাংস খাওয়ার বিধান আছে এবং মুনিঋষিরাও সেটা খেতেন।

খাওয়ার ব্যাপারটা ব্যক্তিগত রুচি ও স্বাধীনতার আওতায় পড়ে— তার জন্য না পড়েই শাস্ত্রের শরণাপন্ন হতে হবে কেন? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ড. সীতানাথ গোস্বামী শাস্ত্র মন্থন করে দেখিয়েছেন যে, ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষদের ধারণাটা মারাত্মক ভুল (স্বস্তিকা, ৩০.১১.১৫)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'যত মত, তত পথ।' সবাই তাঁদের মনোমত ধর্ম নিয়ে থাকুন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে বা বিজ্ঞ সাজার জন্য ভণ্ডামি করতে হবে কেন? জিন্না পৃথক 'হোম্ল্যান্ড' চেয়েছিলেন। তাহলে লোক বিনিময় হয়নি কেন? পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রায় হিন্দুশূন্য হয়ে এসেছে— এই দেশে মুসলমান সংখ্যা বাড়ছে কেন? সীমান্ত জেলায় এত মসজিদ কেন? বাংলাদেশিরা এসে ভোট দিয়ে যায় কেন?

চুকনগর হত্যাকাণ্ড শতাব্দীর বড় কলঙ্ক

মানস ঘোষ

চুকনগরে স্মৃতি ফলক।

এপার বাংলার বাঙালিরা বিশেষ করে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী হয়ে এপারে এসে বসবাস করছেন, তাঁদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা এতটাই আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস করেন যে তাঁরা প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ভিয়েতনামের মাইলাই এমনকী রাখাইনে রোহিঙ্গাদের গণহত্যা নিয়ে কেঁদে ভাসান, কিন্তু তাঁদের 'দ্যাশের' সমগোত্রীয়দের সম্বন্ধে তাঁরা কোনও খোঁজ খবর রাখেন না বা সহমর্মিতা পোষণ করেন না। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁদের সমগোত্রীয়দের ওপর যে গণহত্যার খড়্গ নেমে আসে, সে সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান যে কত সীমিত তা জানা যায় একাত্তর সম্বন্ধে তাঁদের লেখা ও বক্তব্য থেকে। লজ্জার ব্যাপার হলো তাঁরা বাঙালি সমাজে বুদ্ধিজীবী বলে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁদের একজন হলেন প্রখ্যাত বসু পরিবারের পাকিস্তানমনা ইতিহাসবিদ, যিনি অক্সফোর্ডে বসবাসরত। সেই তিনি হলফ করে লিখেছেন, একাত্তরে ৩০ লক্ষ বাঙালি গণহত্যার শিকার হননি, সংখ্যাটি মনগড়া।

তাঁদের এই চরম মিথ্যাচারের জবাব দিতেই আমি সম্প্রতি চুকনগরে যাই, যা খুলনা শহর থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ওই অখ্যাত আধা শহর, আধা গঞ্জ জনপদের প্রতিটি ইটে ও ধূলিকণায় এখনও একাত্তরের এক করুণ ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম অধ্যায় অমলিন হয়ে আছে। এই মর্মান্তিক ইতিহাস সব বাঙালির জানা প্রয়োজন। এই নারকীয় কাণ্ডটি প্রথমে প্রকাশ্যে আনেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও বর্তমানে বঙ্গবন্ধু প্রফেসর পদে অধিষ্ঠিত মুনতাসির মামুন। তিনি একাত্তরের বীর শহিদদের সম্বন্ধে গবেষণা ও জরিপ করতে গিয়েই চুকনগর গণহত্যা সংক্রান্ত ভয়ঙ্কর সব তথ্যাদি জানতে পারেন। তিনি চুকনগরে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে ১০,০০০-এর বেশি বাঙালিকে যে একাত্তরের ২০ মে বুধবারে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম গণহত্যা করা হয়েছিল সেই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেন। হিটলার জার্মানি ও পোল্যান্ডের অশউইটস ও ট্রেবলিঙ্কার মতো বন্দি শিবিরে ২০ লক্ষ ইহুদিদের গ্যাসচেম্বারে পুরে হত্যা করেছিল। কিন্তু পাকবাহিনী সেদিন সকাল দশটা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তার নজির ইতিহাসে নেই।

চুকনগর ভদ্রা ও গাঙ্গরাইল নদীর তীরে একটি বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্র। এক সময়ে চুকনগরের সঙ্গে বহির্বিশ্বের একমাত্র যোগাযোগের বাহন ছিল নৌকা। একাত্তরে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দু শূন্য করার লক্ষ্যে তাঁর সশস্ত্রবাহিনীকে ঢালাও নির্দেশ দেয়। এই কার্যসিদ্ধি করার জন্য গণহত্যাকে বেছে নেওয়া হয়। এপ্রিল থেকে পাকবাহিনী সেই নির্দেশ কার্যকর করতে শুরু করে। যেহেতু চুকনগর থেকে নদীপথে বরিশাল, পটুয়াখালি ও ফরিদপুরে যাওয়া আসা খুব সহজ ছিল, সেই কারণে ওই সব জেলার হিন্দু বাসিন্দাদের এক বিরাট অংশ

নৌকায় চুকনগরে এসে হাঁটাপথে ভারতের শরণার্থী শিবিরে যেত। ২৯ মে-র রাত্রেও কয়েক হাজার নির্যাতিত, ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দু পরিবার কয়েকশো নৌকায় চুকনগরে এসে রাত কাটিয়ে কাকভোরে ভারতের সীমান্তের (বসিরহাটের দূরত্ব মাত্র ২৩ কিলোমিটার) দিকে তল্পিতল্পা নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

৮১ বছরের এরশাদ আলি মোড়ল চুকনগর গণহত্যার এক প্রত্যক্ষ্যদর্শী। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও ২০ মে-র রোমহর্ষক ঘটনা এখনও তার চোখের সামনে ভাসে। তাঁর দেখা গণহত্যার বিবরণ এই রকম : ''যে হারে হিন্দুরা হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাঁচার তাগিদে চুকনগরে এসে জড়ো হচ্ছিল সেটা দেখে আমাদের ভয় হয়েছিল যে পাকবাহিনী চুকনগরে এসে না গণহত্যা চালায়। কারণ এক সঙ্গে এতো বিশাল সংখ্যক হিন্দুদের এক জায়গায় হাতের নাগালে তারা পাবে না। ইতিমধ্যে কানাঘুষো শুনতে পাচ্ছিলাম মৌলানা ইউসুফ রাজাকার (যে পাক বাহিনীকে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কিত সব খবর জোগাত) ও তার সাগরেদরা সাতক্ষীরায় পাক কমান্ডারকে খবর দেয়, ''হুজুর রোজ চুকনগর হয়ে হাজার হাজার হিন্দু ভারতে পালাচ্ছে। ওদের গণহত্যা করার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।''

'২৯ মে রাত্রে দেখি ভদ্রা ও গাঙ্গরাইল নদীতে শুধু নৌকা আর নৌকা, তাতে পোটলা পুটলি নিয়ে বোঝাই হিন্দু পরিবার। চুকনগর বাজারও হিন্দু পরিবারের ভিড়ে ঠাসা। পা ফেলার পর্যন্ত জায়গা নেই। সে এক দমবন্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছিলাম রাত্রে যেন কোনও অঘটন না ঘটে। সকালে উঠে দেখি নদীতে নৌকোর সারি আরও লম্বা হয়েছে। সাপের মতো এঁকে বেঁকে গেছে। নৌকা থেকে নেমেই পরিবারগুলো চুকনগর বাজারের দিকে দৌড়চ্ছে। বাড়ি ফিরে আব্বুকে নদীর দৃশ্যের বর্ণনা দিলাম। শুনেই তিনি বললেন— ''আজকের দিনটা যেন ভালোভাবে কাটে।'' পরে তাঁর কথার মানে বোঝার চেষ্টা করি। তবে কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি জঘন্য কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে? তিনি ওই কথা বলেই হাতে খুরপি নিয়ে মাঠে চলে গেলেন নিড়েনের কাজ করতে।

'সকাল দশটার কিছু পরে গুলির প্রচণ্ড শব্দে আমি ও আম্মু হতচকিত হয়ে পড়ি। আম্মু আমায় বলেন, যা মাঠে গিয়ে দেখে আয় তোর আব্বু কেমন আছেন। মাঠে গিয়ে দেখি আব্বু গুলিবিদ্ধ হয়ে মাঠে পড়ে আছেন। বুকে গুলি লেগেছিল। মাটি রক্তে ভেসে গেছে। পরিহাসের বিষয় হিন্দুদের গণহত্যা করতে গিয়ে হানাদাররা প্রথমে হত্যা করে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে। আমি দেওয়ালের আড়ালে আশ্রয় নিলাম এবং সেখান থেকে সব দেখলাম। কালো উর্দিপরা হানাদাররা একটা জিপ এবং একটা ট্রাকে করে এসেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। গাড়ি থেকে নেমেই হানাদাররা মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে হিন্দুদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চুকনগর বাজারের দিকে যাচ্ছে। অন্য একটি দল ভদ্রা নদীতে যে সব নৌকায় করে হিন্দুরা এসেছিল তাদের লক্ষ্য

প্রত্যক্ষদর্শী এরশাদ আলি মোড়ল

করে গুলি ছুঁড়ছে। তারা নদীতে বা মাটিতে পড়ে মাছের মতো ছটফট করছে। যারা চুকনগর বাজারের দিকে পালাচ্ছিল তারাও গুলিবিদ্ধ হয়ে টপটপ করে মাটিতে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল। গুলির বিকট শব্দ, মানুষের হাহাকার ও কান্নার রোল আকাশ বাতাস কাঁপছিল। চোখের সামনে দেখছি ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি উড়ে যাচ্ছে। মানুষ উদভ্রান্ত হয়ে দৌড়চ্ছে।

'হঠাৎ আমার চোখ পড়ল গুলিবিদ্ধ এক মৃত মায়ের বুকের ওপর। একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু কাঁদছে এবং থেকে থেকে মার বুকের দুধ খাচ্ছে। শিশুটির দেহ মায়ের রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে। আমি গুলির পরোয়া না করে দৌড়ে শিশুটিকে মায়ের বুক থেকে তুলে নিজের কোলে নিলাম। শোঁ শোঁ করে গুলি কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। শিশুটিকে বাড়িতে আনলাম। আম্মুকে বললাম, আব্বু খান সেনার গুলিতে মারা গেছে। কিন্তু তাঁর বদলে এই শিশুটিকে পেলাম। তাঁকে বললাম শিশু কন্যাটি হিন্দু পরিবারের। ওর মা গুলি খেয়ে মাঠে মরে পড়ে আছে। ভাবলাম আব্বুকে হারিয়েছি। যদি এই শিশুটির প্রাণ বাঁচাতে পারি। সেই জন্য বাড়িতে নিয়ে এলাম। আম্মু শিশুটিকে কোলে নিয়ে গোসল করাতে গেল। বললেন, শিশুটি আমরাই মানুষ করবো। বাইরে তখনও গুলি চলছে। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম এই আশায় যদি ওই শিশুটির মতো আরও কাউকে বাঁচাতে পারি। গোলাগুলির ভয় আমাকে দমাতে পারেনি। আমি হেঁটেই চুকনগর বাজারে পৌঁছালাম। সেখানে দেখি মৌলানা ইউসুফ রাজাকার ও তার সাগরেদরা লাশের স্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সঙ্গে হানাদার বাহিনী। যাদের দেহে একটুও প্রাণ আছে বা যারা হাত পা নাড়ছে, তাদের হাতের শিরা বা গলার নলি কেটে দিচ্ছে এবং হানাদাররা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে। লাশের ওপর লাশ আর তার ওপরেও লাশ। সেই বীভৎস দৃশ্য ও বাজারে রক্তের নদী দেখে আমার দেহ অসাড় হয়ে গেল। লাশের ওপর কতক্ষণ পড়ে রইলাম জানি না। জ্ঞান ফিরলে হেঁটে ভদ্রা নদীর পারে গেলাম। দেখি নদীর পানির রঙ লালচে ধূসর হয়ে গেছে। দুপুর তিনটে পর্যন্ত গুলি চললো। হিন্দুদের লাশ দেখে হানাদারদের সে কী উল্লাস। আব্বুকে দাফন করে বাড়ি ফিরলাম। আসার সময় নদীর তীরে মৃতের পাহাড় দেখলাম। যতদূর চোখ যায় শুধু লাশ আর লাশ।

কিন্তু এত লাশ ফেলবো কোথায়? গণকবর দিতে হলে সারা চুকনগরের মাটি খুঁড়তে হবে। আর গণসৎকার করতে গেলে চুকনগরের সব গাছ উজাড় হয়ে যাবে। বর্তমানে যেখানে শহিদ স্মারক আছে সেখানে আমি অন্যদের সাহায্য নিয়ে ৩০০০ লাশের গণকবর দিয়েছি। যখন কবর খুঁড়ছি তখন দেখি হানাদার বাহিনী আকাশে গুলি ছুঁড়ে ও উল্লাস করে গাড়িতে চড়ে চুকনগর ছাড়ছে। প্রায় হাজার খানেক লাশ নদীতে ফেলা হলো প্রায় দুদিন ধরে। মাঠে ঘাটেও লাশ পড়ে রইল। পরদিন চুকনগরের আকাশে ঝাঁক ঝাঁক শকুনিদের দেখা পেলাম। মৃতদেহগুলোকে 'সাফ' করতে প্রায় তিন সপ্তাহ লেগেছিল। দুর্গন্ধের জেরে অন্য গ্রামে গিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। চার বছর আমরা আমাদের দুই নদী ও স্থানীয় পুকুরের মাছ খাইনি। প্রায় এক বছর চুকনগরে লোকেদের যাওয়া আসা বন্ধ ছিল। ভদ্রা ও গাঙ্গরাইলে যেহেতু জোয়ার ভাটা খেলে, নদীতে ফেলা লাশগুলো ভেসে চুকনগর ঘাটে এবং পুরো নদী জুড়ে জড়ো হতো। সে এক নারকীয় দৃশ্য। শয়ে শয়ে লাশ ভেসে এসে নদীগুলোকে ভরিয়ে দিতো রোজ। আমরা থাকতে না পেরে লাশগুলোকে উজানে জড়ো করে তাদের পা এক সঙ্গে বেঁধে নদীর তীরে বড়ো গাছগুলোর সঙ্গে বেঁধে দিতাম যাতে সেগুলো আবার চুকনগরে ভেসে না আসে।

'সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেই আম্মু বললেন, আমি শিশুটির নাম সুনারী রাখতে চাই। নামটা শুনেই আমিও রাজি। বললাম দেখতেও সুন্দর নামটাও সুন্দর। বললাম সুনারীর মৃত মার কপালে টিপ ও সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছিলাম। ওকে হিন্দু আচার বিচার মেনেই মানুষ করতে হবে। ওকে মুসলিম আদব কায়দায় বড়ো করবো না। লেখাপড়ার জন্য ওকে স্কুলে পাঠাবো, মাদ্রাসায় নয়। যাতে হিন্দু পড়োশিরা আমাদের দিকে আঙুল তুলে বলতে না পারে এরশাদেরা একটি হিন্দু শিশুর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মুসলমান করে মানুষ করল। সুনারীর বড়ো হওয়া আমাদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা ছিল। ওর বিয়ের জন্য টাকা জমাতে শুরু করি। সুনারী যখন ডাগর হয়ে উঠলো তখন আমি ওর জন্যে এক সৎ হিন্দু পাত্রর খোঁজ শুরু করি। নিজের জমানো টাকা ও পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে ওর বিয়ে দিলাম। ও এখন সুনারী বালা। বরাত জোরে হানাদারদের হত্যা থেকে ওর বেঁচে ফেরা। এবং এক মুসলমান পরিবারে ওর বেড়ে ওঠার গল্প সুনারী সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কৌতুহল বাড়িয়ে দেয়। ডুমুরিয়া থানার সবার মুখে মুখে ওর গল্প শোনা যেতে লাগলো। সুনারী যে আমাদের পরিবারের মেয়ে হয়ে উঠেছিল সেটা বুঝলাম সেদিন ও বিয়ে করে তার স্বামীর বাড়ি চলে গেল। সুনারী তো এখন ডুমুরিয়ার শিল্পকলা একাডেমির দপ্তরে চাকরি পেয়েছে।'

আমি এরশাদকে জিজ্ঞাসা করি ''কলকাতা ও ঢাকায় অনেকে বলছে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালি গণহত্যার শিকার হননি। তারা বলছে এসব বানানো গল্প।'' এরশাদের উত্তর, ''ওদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি ওদের ইতিহাস পাঠ নেবো এবং চুকনগর কলেজের মাটি খুঁড়ে কয়েক হাজার খুলি ও কয়েক লক্ষ হাড় ভেট দেবো।' চুকনগর স্মৃতিফলকের কেয়ারটেকার রফিকুল ইসলাম হঠাৎ ভিজিটার বুক বার করে দেখালেন দুটি মন্তব্য। মন্তব্য দুটি পাকিস্তানি গবেষক বেগম আনম জাকারিয়া ও হারুন খালিদের। তাঁরা লিখেছেন, ''চুকনগরে পাকিস্তান যা করেছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।'' ■

বাঙালির জতুগৃহ নির্মাণের কাণ্ডারি বামপন্থীরা

পুলকনারায়ণ ধর

বাংলা ও বাঙালির জীবনে আজ এক গভীর দুর্দৈব চলছে। বাঙালি কার্যত চালচুলোহীন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ধূমকেতুর মতো ছুটে চলেছে। হিংসা ও হিংস্রতা তাকে গ্রাস করেছে। প্রতিদিন কাগজ খুললে বা মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে মারদাঙ্গার ছবি। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে জ্বলে উঠছে আগুন। সকলে যেন এক জঘন্য হত্যালীলায় লিপ্ত হয়ে পড়ছে। পথদুর্ঘটনা, চায়ের দোকানে বচসা, হাসপাতালে রোগীমৃত্যু, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংঘর্ষ সব ছোট-বড় ঘটনা থেকে জন্ম নিচ্ছে নিয়ন্ত্রণহীন গণ্ডগোল ও উন্মত্ততা। কিন্তু কেন এই ভয়ঙ্কর অবস্থা? মানুষ হঠাৎ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে কেন? এর জন্য দায়ী কে বা কারা?

এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে আমাদের একটু পেছনের দিকে তাকাতে হবে। এই পেছনের ইতিহাস শুধু বাংলার রাজনীতির ইতিহাস নয়--- বিদ্বেষের রাজনৈতিক পশ্চাৎপট একটু বোঝা দরকার। কারণ এর সঙ্গেই আমাদের বাংলার ভাগ্য জড়িয়ে দিয়ে আমাদের অবনমন ঘটানো হয়েছে। এর জন্য দায়ী তথাকথিত বামপন্থীরা, মূলত সিপিএম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায়ই একটা প্রশ্ন এবং সংশয় মানুষের মনে উঠত। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা কি কমিউনিস্ট রাশিয়া ও আমেরিকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে শীঘ্রই বেজে উঠবে? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে বিশ্বের বহু দেশ, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলির ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু ৭০ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে কোনও বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। একবার ১৯৬২ সালে কিউবাকে কেন্দ্র করে দুই বৃহৎ শক্তির দ্বৈরথ বিশ্ববাসীকে তীব্র ভয়ার্ত উত্তেজনার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। যুদ্ধ না ঘটলেও এরা মানুষকে তাতিয়ে দিয়েছিল। সেই উত্তাপ নানাভাবে আমাদের দেশে ও রাজ্যেও পড়েছিল। দেশে উত্তাপ আর না অনুভূত হলেও রাজ্যে কিন্তু এই উত্তাপকে ধরে রাখা হলো। কমিউনিস্টদের দক্ষতায় বাঙালি 'সাম্রাজ্যবাদী' আমেরিকা'র বিরুদ্ধে ফুঁসতে শুরু করল। আমেরিকার বিরুদ্ধে একটা ঘৃণা সৃষ্টি করে তা রাজনৈতিক ভাবে দেশের শাসক দল কংগ্রেসের দিকে সঞ্চালিত করা হলো। তথাকথিত আদর্শের ধ্বজা তুলে কমিউনিস্টরা গদি দখলের রাজনীতি করে। রাশিয়া ও আমেরিকার ঠাণ্ডা লড়াই বহুকাল সমাপ্ত হলেও কমিউনিস্টরা গরম রইল। বাঙালিকে গরম রাখল। সমাজতন্ত্র ও ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়ে যুব সমাজকে উত্তেজিত রেখে শাসকদলের বিরুদ্ধে একটি প্রকট লড়াই ঘোষণা করা হলো। এই লড়াইকে ক্রম উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে হিংস্রতার সৃষ্টি করা হলো। এর পোশাকি নাম হলো 'বিপ্লব'। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষ এই 'বিপ্লবে'র পথে পা বাড়ায়নি। তারা সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে থেকেই চলতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রথম থেকেই মারদাঙ্গা ও হিংসার প্রসারকেই প্রধান অস্ত্র হিসাবে বামপন্থীরা স্থাপন করেছে। নিজেদের সংগঠনকে শক্ত করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক সংবিধান না মানার অ্যাকশনধর্মী রাজনীতি ও কৌশল তারা বাঙালি যুবসমাজকে শিখিয়েছে। তারা বোঝাল যে, উন্নতি মানেই বামপন্থীদের পথ অনুসরণ করা। দক্ষিণপন্থীরা হলো জনস্বার্থ বিরোধী। একটা কৃত্রিম বিভাজন--- দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী। পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হলো কুরুক্ষেত্র।

এই নাট্যমঞ্চ কিন্তু এক দিনে তৈরি হয়নি। বাংলায় এর সূচনা হয়েছিল দেশ বিভাগের জন্মলগ্ন থেকে। দেশভাগের পূর্বে যা ছিল ক্ষীণ। দেশ বিভাগের পর (১৯৪৭) তা হলো বিকট। দেশ বিভাগ এই বাংলার মানুষকে বিশেষ করে হিন্দু বাঙালিকে ধনী-নির্ধনী নির্বিশেষে কংগ্রেস দলের প্রতি বিদ্বিষ্ট করেছিল। পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ধন মান ভিটে মাটি হারিয়ে হিন্দুবাঙালি উদ্বাস্তু স্রোত এল পশ্চিমবঙ্গে। তখন থেকেই স্বাভাবিক কারণে কংগ্রেসকে বাঙালির এক বড় অংশ বিশ্বাসঘাতক ও শত্রু বলে গণ্য করে। বামপন্থীদের বহু নেতা পূর্ববঙ্গ থেকেই এসেছিলেন। তারা এখানে এসে মানুষের ত্রাতা হয়ে গেলেন। তারা এই ক্ষোভকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঘৃণার রাজনীতিতে পরিণত করেন। বিরোধী রাজনীতির ভিত তৈরি হলো ঘৃণার ওপর। এটাই পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে আপামর বাঙালির রাজনীতির মূল সুর হয়ে দাঁড়াল। কংগ্রেসের প্রতি ঘৃণা ও হিংসা কিন্তু প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের ছিল না। গান্ধী-নেহরুর প্রতি ছিন্নমূল মানুষের যে ঘৃণা ছিল গ্রামেগঞ্জের মানুষের মধ্যে তার ছিটে ফোঁটাও ছিল না। সুতরাং ১৯৪৭ সালে বামপন্থীরা সারারাজ্যে কল্কে পাওয়ার মতো অবস্থায় তখন ছিল না। যদিও বিষবৃক্ষ

রোপিত হয়ে গেছে। তখনও ‘বাঙাল- ঘটি’ মানসিক-বিভাজন বামপন্থীদের কর্মসূচি রূপায়ণে একটি অন্তরায় ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বহুদিন ‘বাঙাল’ পার্টি বলেই পরিচিত ছিল। শ্রমিক কৃষকদের দল বলে নিজেদের ঘোষণা করলেও তারা কিন্তু মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে আসা রিফিউজিদের মধ্যেই ঘাঁটি গাড়ার উদ্যোগ নিল। এদের নিয়েই রচিত হলো ঘৃণা ও হিংসার রাজনীতি। বাঙালির ‘জতুগৃহ’। একটা নেতিবাচক পথে ঠেলে দিয়ে এরা বাঙালির ঘুরে দাঁড়াবার উদ্যম ও উৎসাহকে বিনষ্ট করে দিল। শুধু এটা চাই, ওটা চাই, দিতে হবে, দিতে হবে করেই তাতিয়ে রাখল। নতুন মন্ত্র হলো ‘লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই।’ একটা জাতিকে পঙ্গু করে দাও। তার হাতে তুলে দাও ‘ক্র্যাচ’।

আজকের বাঙালির ও বাংলার-হিংসার জন্ম কমিউনিস্টদের তৈরি করা ‘ঘেটো’ সংস্কৃতি থেকে। তাদের উদ্যম ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিনষ্ট করে উদ্বাস্তুদের বাধ্য করল সরকারি ‘ডোলের’ ওপর নির্ভর করতে। কর্মহীন যুবকদের মধ্য থেকেই সংগ্রহ করতে হবে দলের কর্মীদের। এর ফলেই আমাদের রাজ্য হয়ে ওঠে হিংস্রতা ও ঘৃণার কুণ্ড। ১৯৫৩ সালে ট্রাম আন্দোলন, ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন--- ট্রাম পোড়ানো, অফিস ভাঙচুর, কম্পিউটার আটকানো ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন রাজনীতির সূচনা হলো। বাস পোড়ান ও পুলিশ পেটান বাংলার রাজনীতির সংস্কৃতি হয়ে উঠল। সেই রাজনীতি আজ স্থায়িত্বের মর্যাদা পেয়েছে। তাই কথায় কথায় দাঙ্গা, মারপিট, শিক্ষক পেটানো, অপভাষা, সন্ত্রাস এসব আজ আমাদের রাজ্যবাসীর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। কমিউনিস্টরা এক সময় বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষের মতো নেতাদের নামে কুৎসিত বিশেষণ প্রয়োগ করেছিল। প্রতিপক্ষদের সম্পর্কে সিপিএম (কমিউনিস্ট পার্টির ভগ্নাংশ) ক্ষমতায় থাকার সময় কুৎসিততম ভাষা প্রয়োগ করেছিল। আজ সেই হিংসা ও অসহিষ্ণুতার সংস্কৃতিই প্রবাহিত হচ্ছে। নতুন শাসক দলের নেতা নেত্রীদের মুখেও সেই লাগামহীন অশ্লীল শব্দের মিছিল অব্যাহত।

কোনও বিরুদ্ধ মত বা সংগঠন দেখলেই শাসক দল ভীত হয়ে পড়ছে। তাকে এক মুহূর্তও সহ্য করার শক্তি নেই। সমস্ত নির্বাচনকে বিরোধী শূন্য করে দেওয়ার ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী। কর্মীরা উজ্জীবিত। এই কর্মীরা কেউ অটোরিক্সা চালায়, কেউ বাস কন্ডাক্টর, কেউ ছাত্র নামধারী। এরা রাজনীতির বাইরের জগতেও লড়াকু। এরা দলের ‘স্টেরয়েড’ নিয়ে ঘটোৎকচ হয়ে উঠেছে। পুলিশ প্রশাসন এদের সমীহ করে। মহিলাদের উত্যক্ত করে আবার তাকেই পেটাতে যায়। মাথায় ফেজ টুপি থাকলে তো কথাই নেই। পান থেকে চুন খসলেই এদের মেজাজ চড়ে যায়। তৈরি হয়েছে গুণ্ডার দল। রাজনীতির কুশিক্ষার ফলে এই ধারা ও মানসিকতা তৈরি হয়েছে।

অরাজনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে তাই মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। যেখানে রাজনীতির দাদাদের উস্কানি নেই, সেখানেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। মধ্যমগ্রামের সিভিক পুলিশের ওপর আক্রমণ, চিংড়িঘাটায় লাগামহীন আক্রমণ, এসব থেকে বোঝা যায় যে সাধারণ মানুষ পুলিশ প্রশাসনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। রাজনৈতিক দাদাদের মুখের কথার আশ্বাসে তাদের বিশ্বাস নেই। এটা সাধারণ মানুষের সরকারের ওপরই অনাস্থার প্রকাশ। মানুষ যখন আশাহীন ও দিশাহীন হয়ে পড়ে তখন এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে। হিংসা আগুনের মতো গুজবের ডানায় ভর করে ছুটে যায় নানা দিকে। উপযুক্ত কোনও রাজনৈতিক পথ না পেলে মানুষের ক্ষোভ এই ভাবেই প্রকাশ পায়।

অতীতের একটি ঘটনা উল্লেখ করে এই বিষয়টির ইতি টানব। ১৯৬৪ সালে অক্টোবর মাসে কলকাতার ইডেন উদ্যানে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলা। ইডেনে কর্তৃপক্ষ হিসাব বহির্ভূত ভাবে এত বেশি আসনের টিকিট বিক্রি করেছিল যে দর্শকরা মাঠে গিয়ে অনেকেই বসতে পারেননি। কর্তৃপক্ষ নির্বাক ও উদাসীন। হৈ-হট্টগোল শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে দর্শকদের শায়েস্তা করতে পুলিশ স্টেডিয়ামে উঠে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে একজন বিশিষ্ট দর্শক (সীতেশ রায়) মাঠে নেমে পুলিশ কর্তাদের কাছে যান। কর্তারা প্রথমে জানতে চান তাঁর পরিচয়। তিনি বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে বললেন ‘I am a member of the community of ordinary citizens.’ পুলিশ এর পরই ভদ্রলোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাঠের মধ্যেই তাঁকে পেটাতে শুরু করে। এই দৃশ্য ইডেনের হাজার হাজার দর্শকের ক্ষোভে ঘৃতাহুতি দিল। তারা মাঠে নেমে পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশ ও দুই দলের খেলোয়াড়রা ঊর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে পারল ছুটে পালালেন। গঙ্গার ধারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তখন ছুটছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড় স্মিথ ও গিলক্রিস্ট। পুলিশ সেদিন উর্দি ছেড়ে গেঞ্জি গায়ে রাস্তায় ছুটে পালিয়েছে। এই ঘটনার বহু আগে রাজ্য সরকারের মন্ত্রিত্বের ঔদ্ধত্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কংগ্রেসি মন্ত্রী নেতাদের দুর্নীতি সত্যমিথ্যা মিশিয়ে সিপিএম ও বামেরা সাধারণ মানুষকে যা বুঝিয়েছে তাতে মানুষ ভেতরে ভেতরে অনেকদিন ধরেই ফুঁসছিল। ইডেনের ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেই বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছে। সরকারের ওপর যখন আস্থা টুটতে থাকে, মানুষ তখন এই ভাবেই নিজের প্রকাশ ঘটায়। প্রশাসন ও পুলিশকে আক্রমণ করে। মধ্যমগ্রামে, চিংড়িঘাটার ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ। ইদানীং রাজ্যের শাসকদল যেভাবে মুসলমান তোষণ শুরু করেছে তাতে এদের বাড়বাড়ন্ত দেখে হিন্দুদের মধ্যে একটা ভীতি ও ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। যে-কোনও দিন যে-কোনও জায়গায় তার অবাঞ্ছিত বহিঃপ্রকাশ ঘটলে আশ্চর্য হওয়ার নেই। কারণ হিংসা আজ যে রাজনীতির ভাষা হয়ে উঠেছে সেই হিংসার সংস্কৃতিই খণ্ড খণ্ড দুর্যোগের সৃষ্টি করছে। নরকের প্রচ্ছন্ন ময়দানে পিশাচসিদ্ধতা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অরাজনৈতিক বিক্ষোভ থেকেই জন্ম নেবে রাজনৈতিক সুনামি। ■

বাজেট যুগপৎ সংস্কারমুখী ও সমব্যথী

শেখর সেনগুপ্ত

কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের হয়ে ঢাক পেটাবার অপবাদ যেমন আমার নেই, তেমনি যা সত্যি ও নির্ভেজাল সেই উচিত কথা জানাতে ভেতরটা আমার বর্শার ফলার মতো তীক্ষ্ণমুখও হয়ে থাকে। অথ বাজেটিয় লেখায় ব্রতী হবার আগে এই কথা কবুল করে রাখলাম। ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮-এর আগের দিনটিতেও বিজেপি-বিরোধী একাধিক স্থানীয় নেতা চোখের সামনে হাত নেড়ে এমন সব কথা বলছিলেন যেন এই বাজেট সংসদে পেশ হবার আগেই তাঁরা হাটে হাঁড়ি ভাঙতে চলেছেন। চোখ সরু করে এঁরা বলছিলেন, এমনকী কাগজেও লিখেছেন, 'মোদী-জেটলির বাজেট হবে ঘনায়মান নির্বাচনী যুদ্ধে আত্মরক্ষার শেষ আয়ুধ। দেখবে, আয়করে বিশাল ছাড় দেওয়া হবে, প্রভাবশালীদের নানাভাবে পাইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি থাকবে কেবল এলোপাথাড়ি প্রতিশ্রুতির আছাড়ি-পিছাড়ি --- যা বাস্তবায়িত হওয়া কেবল মুশকিল নয়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেও বাধ্য।'

বাজেট প্রস্তাব ভূমিষ্ঠ হবার আগে বিরোধীদের ইত্যাকার কলরব এ দেশের পুরনো কালচার এবং সেটা আমাদের বরাবরের অভিজ্ঞতা। অনেকে আবার এখান থেকেই নির্বাচনী ঢাক পেটাতে শুরু করেন— পরবর্তী পর্যায়ে যা অতি লোভে তাঁতি নষ্টের নির্দশনও হয়ে থাকে।

এই রকম বাতাবরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী অরুণ জেটলি ঋজু ইংরেজিতে তাঁর বাজেট বৃত্তান্ত পেশ করলেন সংসদে এবং বলতে গেলে প্রায় সারাটা দিনে আমি পাঁচ মিনিটের জন্যও টিভির কাছ থেকে উঠে আসিনি।

প্রথমেই বলছি, আয়করের কথা। বিরোধীরা বলেছিলেন, দেখবেন, ওই আয়করের টোপ ফেলেই দেশের মধ্যবিত্তদের হৃদয় ক্রয় করতে চাইবেন মোদী-জেটলি। বাস্তবে দেখলাম, বিরোধীদের টিপ্পনীটা মাঠে মারা গেল। মধ্যবিত্ত ও চাকরিজীবীদের চোখের মণি হবার চেষ্টা করেননি অরুণ জেটলি। আয়করের ঊর্ধ্বসীমা ও স্তর-বিভাজন থাকছে অপরিবর্তিত। তবে করবিন্যাস এক থাকলেও এমন কিছু সুবিধা অবশ্য চাকুরিজীবীদের দেওয়া হবে, যাদের জন্য তাঁরা বিত্তমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শাপশাপান্তের আওয়াজ তুলতে অন্তত দু'বার ভাববেন। টি.এ. মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ইত্যাদির বিল জমা দিয়ে বেতনভোগীরা তাঁদের নিয়োগকর্তার কাছ থেকে যে টাকা খানিক পেয়ে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে এক বড়সড় আয়করে সুবিধা দিতে সরকার চালু করতে চলেছেন ৪০ হাজার টাকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন— যা কর্মীদের করের বোঝা কিছুটা হালকা করবে নিশ্চিত।

মহিলা কর্মীদের জন্য রয়েছে বিশেষ সহায়তা। এতকাল তাঁদের বেতনের ১২ শতাংশ জমা দিতে হতো এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ডে। এখন সরকার সেটা কমিয়ে করতে চাইছে ৮ শতাংশ। বাজেট প্রস্তাবে জেটলি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য যেসব সুবিধা দানের প্রস্তাব রেখেছেন, তার একটিও নেহাতই সাধারণ নয়। প্রত্যেক প্রবীণ অতঃপর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রকৃতই তাঁদের সহমর্মী। এতকাল সুদ বাবদ আয় ১০ হাজার টাকা অতিক্রম করলেই তার ওপর আয়করের থাবা নেমে আসত। প্রবীণদের এবার থেকে ৫০ হাজার টাকা অবধি সুদবাবদ আয় আয়করের আওতায় থাকছে না। এই একটিমাত্র ঘোষণাতেই আমার চেনাজানা অনেক অবসরপ্রাপ্ত সুদনির্ভর প্রবীণ ব্যক্তি সরকারি সিদ্ধান্তের যে প্রশস্তি গাইলেন,

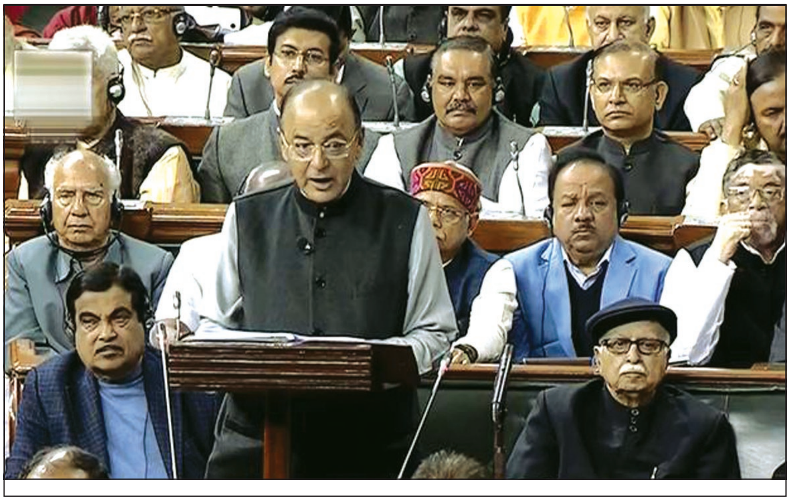

সেটাই তাঁদের স্বস্তিপূর্ণ মানসিকতার জলজ্যান্ত অভিপ্রকাশ। বয়স্কদের চিকিৎসা ব্যয়ে প্রিমিয়াম বাবদ ছাড়ও ৩০ হাজার থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৫০ হাজার টাকায়। আয়কর আইনের ৮০ ডিডিবি ধারা মোতাবেক কয়েকটি নির্দিষ্ট সংকটজনক অসুখের চিকিৎসায় প্রবীণ ব্যক্তির কর ছাড়ের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ১ লক্ষ টাকা। বাজেটের সবচেয়ে আকর্ষক প্রস্তাবটিকে চিনে নিতে কারোর ভ্রম হবার কথা নয়। প্রকল্পটির নাম 'আয়ুষ্মান ভারত'। অতি ব্যাপক স্বাস্থ্য সুরক্ষার পরিকল্পনা— যার আওতায় আসবে দেশের ১০ কোটি নিম্নবিত্ত পরিবার। ১০ কোটি পরিবার মানে ৫০ কোটি মানুষ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ।

৫ লক্ষ টাকার সীমায় আবদ্ধ প্রতিটি বিমার প্রিমিয়াম হিসেবেই সরকারকে প্রতি বছর ৩৩০ কোটি টাকা গুনতে হবে। টাকার অঙ্ক ক্রমেই যে বাড়বে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ বিশেষজ্ঞ অমিতাভ সরকার জানালেন, 'এত বড় প্রকল্প বছরের পর বছর টেনে যাওয়াটা বিশ্বের যে কোনও রাষ্ট্রের পক্ষেই অতি দুরূহ কর্ম।'

মোদীজীকে সেলাম, তিনি এরকম একটা হিতকর ঝুঁকি নিতে চলেছেন, বিশেষত, এই ধরনের প্রকল্পে যখন প্রায়শ দুর্নীতি এসে বাসা বাঁধে। এতে তীক্ষ্ণ নজরদারির দরকার হবে। তাঁর বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বেশ কয়েকবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এ দেশের শিক্ষামান সম্পর্কে। একেবারে প্ররোচিত না হয়েই বলা যায়, বহু বিদ্যাঙ্গনেই এখন যেন শিবঠাকুরের আপন দেশ স্থাপিত। এই রাজ্যের অবস্থাকে তুলনা হিসেবে বিশ্লেষণে টেনে আনলেই তার কিছু সবুদ মিলবে। বিজেপি সরকার তাদের বাজেট প্রস্তাবে সুসংহত পাঠক্রমের সঙ্গে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপরও জোর দিয়েছে। জেলাভিত্তিক শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়টিকে নিয়ে আসা দরকার সামনের সারিতে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের মান ও অংশগ্রহণের হারকেও প্রার্থিত উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। এই মুহূর্তে দেশে চাকরিরত প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ১৩ লক্ষেরও বেশি। সার্বিকভাবে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের বরাদ্দ বাড়তে চলেছে আরও ৩ হাজার কোটি টাকা।

গবেষণা, মেধাবৃত্তি, শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদির এক বৃহৎ প্রকল্পের নাম 'রিভাইটালাইজিং ইনফ্রাস্টাকচার অ্যান্ড সিস্টেম ইন এডুকেশন ২০২২'। সরকার আগামী ৪ বছরে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে ১ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করতে ইচ্ছুক। ভারতবর্ষ কৃষিনির্ভর দেশ। দেশের সিংহভাগ মানুষের জীবিকাও কৃষিনির্ভর। এই উন্নয়মুখী বাজেটের বৃহৎ অংশ জুড়ে আছেন তাই কৃষকরা। সরকারের লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে ভারতে কৃষিজীবীদের উপার্জন যেন দ্বিগুণ হয়। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে সর্বকালীন বৃহত্তম অঙ্কের টাকা— ১১ লক্ষ কোটি! উৎপাদিত ফসলের সঠিক দাম থেকে কৃষকরা যাতে বঞ্চিত না হন, তার জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে বাড়িয়ে করা হবে দেড়গুণ। খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণে বরাদ্দ করা হবে দেড় হাজার কোটি টাকা।

রেলের উন্নয়নগতিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করতে বদ্ধপরিকর সরকার। বরাদ্দের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৮ হাজার কোটি টাকা। সকল রেললাইনই অতঃপর হবে ব্রডগেজ। ৬০০টি স্টেশনে কার্যকরী হবে এস্কালেটর, সিসিটিভি এবং ওয়াইফাই। যাত্রীসুরক্ষায় কোনও রকম ঢিলেমি নজরে এলে, তা কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে গণ্য হবে। আরও একটি বিশেষ সংযোজন— ভদোদরায় স্থাপিত হবে দেশের প্রথম রেলের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়।

বেতন যাঁদের বাড়ছে, সেই তালিকায় কর্মী-আধিকারিকরা নেই। আছেন রাষ্ট্রপতি— যাঁর মাসিক বেতন হবে ৫ লক্ষ টাকা; রয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি— তিনি পাবেন প্রতি মাসে ৪ লক্ষ টাকা; আর রাজ্যপালের বেতন হবে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা। প্রতি ৫ বছর অন্তর বেতন বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করা হবে এই ব্যতিক্রমীদের। খাদ্যে ভরতুকি ছিল বছরে ১.৪ লক্ষ কোটি টাকা। নতুন বাজেটে খাদ্যদ্রব্যকে সুলভ করতে সেই ভরতুকিকে বাড়িয়ে করা হবে ১.৬৯ লক্ষ কোটি টাকা। পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ আগে ছিল ৪.৯৪ লক্ষ কোটি টাকা। তা এবার বেড়ে দাঁড়াবে ৫.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কগুলি সরকারি মদত পেয়ে ঋণ দেবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে ৫ লক্ষ কোটি টাকা অবধি।

আয়কর আদায় বাড়বে আরও প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা। দেশের ৫ কোটি অতি দরিদ্র পরিবার বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ পাবেন। প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ২.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা। এটা কিন্তু বড় অঙ্ক নয়। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ জিডিপির ৫.৯৫ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়াতে পারে ৩.৩ শতাংশ আর্থিক বছর ২০১৮-১৯-এ। এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্বে ভারতের স্থান সপ্তম। বাজেটে বলা হয়েছে, ভারত অচিরে উঠে আসবে পঞ্চমস্থানে। বাজেটের প্রভাবে কী কী জিনিসের দাম বাড়বে বা কমবে, তার তালিকা :

যা বাড়বে— সিগারেট, নকল গয়না, এলসিডি/এলইডি টিভি, ট্রাই সাইকেল, মোটর গাড়ি, মোটর সাইকেল, স্কুটার, মোবাইল ফোন, ফার্নিচার, ইলেকট্রিসিটি, সানস্ক্রিন, পারফিউম, টায়ার, মাজন, টয়লেটস্প্রে, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডে কেনাকাটা, সিগারেট লাইটার, ঘড়ি, সিল্ক, স্মার্টওয়াচ, মোমবাতি, ভোজ্য তেল, গ্রহরত্ন, খেলনা, ভিডিও গেম।

যা কমবে--- বিমার প্রিমিয়াম (প্রবীণদের), কাজুবাদাম, সোলার প্যানেল।

যথারীতি বাজেটের খুঁত ধরে বা ধরতে না পেরেও ইতিউতি সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। এটা চলবে। তবে যাঁরা অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করতে জানেন, তাঁরা হয় প্রশংসা করছেন, নতুবা কিছু সমালোচনা করলেও তাতে ঝাঁজ কম। যত ঝাঁজ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর। সামনেই যে ভোট! আমার অভিমত, মোটের ওপর এ বাজেট যুগপৎ উন্নয়নমুখী ও সমব্যথী। ■

মোদীর হেলথ কেয়ার : নিম্নবিত্তের আশার আলো

অম্লানকুসুম ঘোষ

ভারতবর্ষের ২০১৮-১৯ সালের বাজেট অতীত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রণকারী বহু ঘোষণার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। সেই সমস্ত ঘোষণার অন্তরালে একটি ঘোষণা হয়তো অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে, সেটি হলো দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে সরকারের এগিয়ে আসার ঘোষণা। অর্থাৎ মোদী কেয়ারের ঘোষণা।

ঘোষণা অনুযায়ী দেশের দশ কোটি পরিবারের অর্থাৎ পঞ্চাশ কোটি মানুষের চিকিৎসার জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচের দায়িত্ব নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার 'ন্যাশনাল হেলথ প্রোটেকশন স্কিম'-এর অধীনে। বারো লক্ষাধিক কোটি টাকার বার্ষিক বাজেট এই হেলথ্ স্কিম-এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে দু' হাজার কোটি টাকা। হয়তো অর্থমূল্যের এই স্বল্পতার জন্যই তথাকথিত অর্থনীতিবিদরা এই স্কিম-এর ব্যাপারে খুব একটা আহ্লাদিত হননি, বাংলা সংবাদমাধ্যম তো একে ভোট টানার জন্য নেওয়া কৌশল বলেই বর্ণনা করেছে। ঘোষণাটির ব্যাপারে বিশদে চিন্তা করলে দেখা যাবে, দুটি ধারণাই ভ্রান্ত। প্রথমত, প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে বিমা হিসেবে। অর্থাৎ ৫০ কোটি মানুষের প্রত্যেকের জন্যই পাঁচ লক্ষ টাকা লাগবে— একথা অর্থহীন, যারা অসুস্থ হবে তারা অসুখ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাবে। অর্থাৎ দু' হাজার কোটি টাকাতেই এই উদ্দেশ্য সর্বান্তকরণে পূরিত হবে। দ্বিতীয়ত, ভোটমুখী সরকারি অর্থের অপচয়কারী অন্য প্রকল্পগুলির মতো (যে ধরনের প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের মমতা সরকার সিদ্ধহস্ত) নয়। ক্লাবকে টাকা দেওয়া বা মদ্যপানে মৃতের পরিবারকে টাকা দেওয়া এসব ক্ষেত্রে অর্থের ব্যয় সরকার করে, কিন্তু সেই অর্থের খরচ কীভাবে হয় তার হিসাব সরকারের কাছে থাকে না। অর্থাৎ যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ এবং নথিভুক্ত হলো সেই কাজে ব্যবহৃত না হয়ে অর্থ কোনও অন্য কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। এটাই হলো অপচয়। আবার বিগত কংগ্রেস সরকারের কৃষিঋণ মকুবের ঘোষণার ক্ষেত্রে সরকারি খরচ কোনও স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি বা মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। এটা হলো অপব্যয়। মোদী সরকারের ঘোষিত হেলথ্ স্কিম উপরোক্ত দুটি দোষের কোনওটির দ্বারাই দুষ্ট নয়। কারণ, এই হেলথ্ স্কিম অনুযায়ী ব্যয়িত অর্থ সরাসরি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি পাবে না। বিমা শিল্পের নিয়মানুযায়ী খরচ ক্ষেত্রে সরকার ব্যয় করবে। আর এই ব্যয়িত অর্থ স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি না করলেও মানবসম্পদের উন্নতিতে সহায়ক হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রহিতের কাজ করবে এই স্বাস্থ্যবিমা, ভোট কুড়োনোর প্রহসন বা দলীয় ক্যাডার বৃদ্ধির কাজ করবে না।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, সামান্য অর্থ শুধুমাত্র অসুস্থের চিকিৎসায় খরচের ক্ষেত্রে ব্যয়, এসবের ফলে সাধারণ লোকের কতটুকু উপকার হবে? উত্তরের কথা ভাবতে হলে ভারতবর্ষের লোকের মানসিক অবস্থার এবং উদ্বেগের কথা ভাবতে হবে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ লোক নিজের দৈনন্দিন ব্যয় সংকুলান করেও অর্থ সঞ্চয় করে শুধুমাত্র বড় কোনও রোগে আক্রান্ত হলে কী হবে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আশায়। হয়তো দশজনের মধ্যে মাত্র একজন সেরকম রোগে আক্রান্ত হয় কিন্তু সেই আশঙ্কায় নিজেদের যাবতীয় ভোগব্যয় শিকেয় তুলে সঞ্চয় করে দশজনই। সামান্য আয়ে এরকম সঞ্চয় জন্ম দেয় অপুষ্টির যা পুনরায় রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ রোগের আশঙ্কায় সঞ্চয়— সঞ্চয়ের জন্য খ্যাদ্যাভাব— খাদ্যাভাব থেকে অপুষ্টি— অপুষ্টি থেকে পুনরায় অসুখ। এই এক চক্রের মধ্যে পতিত হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ। অর্থনৈতিক পরিভাষায় যাকে বলে দারিদ্রের দুষ্টচক্র। সেই দুষ্টচক্র থেকে দেশকে মুক্তি দিল মোদীর এই নতুন হেলথ্ স্কিম। আর আয়ের দিক থেকে নিম্নমধ্যবিত্তেরও নীচে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠী, এতদিন বড় কোনও অসুখ হলে মৃত্যুকেই নিয়তি বলে যারা মেনে নিত নীরবে, তাদের কাছে মোদীর এই হেলথ্ কেয়ার যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এর পর থেকে তাদের আর 'দুর্বলের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে তারপরে' নীরবে মরতে হবে না।

অর্থনীতিবিদদের অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, আমেরিকায় যেখানে ট্রাম্প 'ওবামা কেয়ার' বন্ধ করে দিচ্ছেন সেখানে ভারতে মোদী নতুন করে এরকম প্রকল্প চালু করলেন কেন? উত্তরে একটা কথাই স্মর্তব্য, অধিকাংশ ধনী লোকের দেশ আমেরিকায় যে প্রকল্প চালানো সরকারি সম্পদের অহেতুক অপচয়, ভারতের মতো অধিকাংশ দরিদ্র লোকের দেশে সেই প্রকল্প চালানো সরকারি সম্পদের সদ্ব্যবহার। তাই রোগজর্জর ও পাশ্চাত্যের তুলনায় কম গড় আয়ুর দেশ ভারতে মোদীর এই হেলথ কেয়ার স্কিম এক নতুন আশার সূর্যোদয়। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

এবারের বাজেটের অভিমুখ জনকল্যাণ

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

পৃথিবীর অর্থনীতির আয়তন ৭৮ ট্রিলিয়ন ডলার। সেখানে ভারতের অর্থনীতির আয়তন ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার, পৃথিবীর মোট অর্থনীতির ৩.৫ শতাংশ। পৃথিবীর জনসংখ্যার ১৭ শতাংশের বাস ভারতবর্ষে। আমাদের মতো জনবহুল চীনের অর্থনীতির আয়তন ১১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর অর্থনীতির ১৫ শতাংশ অধিকার করে রেখেছে পৃথিবীর জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ। দেশে দেশে অর্থনীতির তারতম্যের সঙ্গে মানুষের আয়ের বৈষম্য চোখে পড়ার মতো। ভারতে ১ শতাংশ মানুষের কাছে ৭৩ শতাংশ সম্পদ আছে অর্থাৎ ধনী দরিদ্রের সম্পদ ভাগ ১,৭১, ২৪০ : ২৩৫১। চীনে ১ শতাংশ মানুষের কাছে ৪৮ শতাংশ সম্পদ আছে। ধনী-দরিদ্রের সম্পদ বণ্টন ২,০৬,১৪৭ : ৪৩২৮। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর দেশ গঠনে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা স্থাপনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের সরকারিকরণ শুরু হয়। ১৯৯১ সালে মনমোহন সিংহ উদারীকরণের পথে দেশকে নিয়ে যান, যা নেহরু অর্থনীতির বিপরীত যাত্রা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন উদারীকরণ দুর্নীতির পাহাড় জমিয়ে তোলে। ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ৭৩ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি এদেশে সংঘটিত হয়েছে। বাজেট পেশ হয়েছে, কিন্তু পক্ষপাতগ্রস্ত প্রশাসন তাকে কার্যকর করতে পারেনি। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার শপথ নিয়েছে স্বচ্ছ নিরপেক্ষ কার্যকর সরকার পরিচালনার। সেই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের জন্য ২৪,৪২, ০০০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। যদিও গত বছর বিমুদ্রীকরণ ও জি এস টি'র কারণে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৭৫ শতাংশ হয়েছে এবং রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ নির্ধারিত ৩.২ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৫ শতাংশ।

গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ১৪.৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। খরিফ শস্যের দাম ক্রয়মূল্যের সঙ্গে ৫০ শতাংশ লভ্যাংশ যুক্ত করে নির্ধারণ করার কথা বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে কৃষকদের আয় বাড়বে। ২২,০০০ গ্রামীণ হাটকে ২,০০০ কোটি টাকা খরচ করে গ্রামীণ বাজারে উন্নীত করা হবে যাতে সুসংহত কৃষি বিপণন সম্ভবপর হয়। ৫০০ কোটি টাকা অপারেশন গ্রিন প্রকল্পে ব্যয় করা হবে কৃষিপণ্য বাজারজাত করার জন্য। কৃষিতে ১১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। মৎস্য ও পশুপালনে ১০০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবে।

জনকল্যাণমুখী অর্থনীতির আদলে ১৬,০০০ কোটি টাকা খরচ করে ৪ কোটি গরিব পরিবারের ঘরে আলো জ্বালাবে। উজ্জ্বলা যোজনায় ৮ কোটি মহিলাকে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হবে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে ৬ কোটি শৌচাগার নির্মাণ হবে। ১০ কোটি পরিবারে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা বিমা। ৫০ কোটি মানুষ এই বিমার অধীনে আসবে। যার অর্থ ১০০ কোটি জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ এই বিমার আওতায় আসবে। কেউ কেউ একে 'মোদী কেয়ার' বলছেন। চিকিৎসা, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ ১.২২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। স্কুলশিক্ষা ও সাক্ষরতার জন্য ৫০,০০০ কোটি টাকা এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ৩৫,০১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পরিকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব। রেল পরিকাঠামোতে ব্যয় ১,৩১,০০০ কোটি টাকা থেকে ১,৪৮,০০০ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৯,০০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২০০০

কিলোমিটার রাস্তা ধরে ৭১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এয়ারপোর্ট থেকে নিউগড়িয়া পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্পে ৩৪৪ কোটি টাকা, বারাসাত থেকে নোয়াপড়া মেট্রো প্রকল্পে ২১২.৫ কোটি টাকা, জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো প্রকল্পে ১৬৯ কোটি টাকা, বরানগর-দক্ষিণেশ্বর মেট্রো প্রকল্পে ৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ১৬৪৬.৮০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে চান্ডিল- আনাড়া-বার্নপুর বিভাগের মধ্যে তৃতীয় লাইনের সম্প্রসারণের জন্য। তালগরিয়া স্টেশন থেকে আদ্রা বিভাগের বোকারো এন কেবিন সেকশনে ডবল লাইনের জন্য ৩৯০.৩৯ কোটি টাকা টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পুরুলিয়া-কোটশিলা বিভাগে ডবল লাইনের জন্য ৩৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বাঁকুড়া- মশাগ্রাম বিভাগে বিদ্যুতায়নের জন্য ৯২.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। টেলিকম পরিকাঠামোতে ১০০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পে করের হার ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে, এতে ৫০ কোটি টাকার ব্যবসা, পরিবর্তে ২৫০ কোটি টাকার ব্যবসা এই সুবিধা পারে। এই ক্ষেত্রকে ৩,৭৯৪ কোটি টাকা অনুদান এবং ৭০০০ কোটি টাকা কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কৃষি সরঞ্জাম উৎপাদন করে এমন প্রতিষ্ঠানকে ১০০ শতাংশ কর ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে যদি তার মুনাফা ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত হয়।

প্রবীণ নাগারিকদের সুদ বাবদ আয় ১০০০০ টাকার পরিবর্তে ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বয়ঃবন্দনা যোজনার সঞ্চয় ৭,৫০০০০ টাকা থেকে ১৫, ০০০০০ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার থেকে সুদ বাবদ আয় ৮ শতাংশ। প্রবীণদের চিকিৎসা বিমা ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রবীণদের কঠিন অসুখে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রাযোজনায় ৪.৬ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। স্বনিযুক্ত প্রকল্পের বিস্তারে যা সহায়ক হবে। জি এস টি চালুর ফলে স্বীকৃত অর্থনীতির পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। ১ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত মূলধনী লাভের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কর আরোপ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করবে। বিমুদ্রীকরণের জন্য আয়কর দাতার সংখ্যা দেড় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়কর বাবদ রাজস্ব ১২ শতাংশের বেশি বেড়েছে। কৃষিক্ষেত্র ছাড়া ১১ কোটি মানুষ অসংঘটিত ক্ষেত্রে কর্মরত। বর্তমানে ১ কোটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ৪.২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। যাদের গড় আয় ৭,২৯৫ টাকা অর্থাৎ জাতীয় গড় আয় ৮০০০ টাকা থেকে অনেক কম। চাকুরিজীবীদের ৪০,০০০ স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিকিৎসা খরচ ও পরিবহণ ভাতা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মচারীদের সুবিধা ৫২০০ টাকার বেশি বিস্তৃত হবে না। মধ্যবিত্ত মানুষ চূড়ান্ত বাজেট পাশের আগে আরও কিছু সুবিধার আশায় দিন গুনছে।

(লেখক কলকাতার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ)

‘এই বাজেট কৃষক এবং দরিদ্র মানুষের’ : অরুণ জেটলি

এবারের বাজেটে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষিক্ষেত্রের ওপর। কৃষকের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার লক্ষ্যে এবার বাজেটের রূপরেখা স্থির করা হয়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি পরিকাঠামো উন্নত করার কথাও ভাবা হচ্ছে। কৃষি এবং কৃষকের উন্নতির জন্য যেসব প্রকল্প এবার নেওয়া হয়েছে, তা ভালোভাবে দেখলে যে কেউই বুঝতে পারবেন— কৃষিক্ষেত্রের প্রতি কতটা নজর সরকারের। সরকার কৃষিকে অবহেলা করছে— এ অভিযোগ একেবারেই সত্যি নয়। যেমন, এ প্রসঙ্গে আমি একটি বিষয় সবার গোচরে আনতে চাই। নীতিগতভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি একজন কৃষক যাতে তার উৎপাদিত শস্যের ওপর অন্তত ৫০ শতাংশ লাভ করতে পারে— তা বাস্তবায়িত করতেই হবে। এতে কৃষকের অন্তত অভাবী বিক্রির কবলে পড়তে হবে না।

এবার আসুন সামাজিক ক্ষেত্রে। এই সরকারের একটি বড় সাফল্য উজ্জ্বলা প্রকল্প। এই প্রকল্পে আমরা এবার আট কোটি গরিব পরিবারকে লক্ষ্যমাত্রা করেছি। এরই পাশাপাশি এবার গরিব মানুষের কাছে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দিতে হেলথ্‌কেয়ার স্কিম চালু করছে সরকার। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতম ১০ কোটি পরিবারের কাছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দিতে চাই আমরা। এই প্রকল্পে দরিদ্রতম ১০ কোটি পরিবারের মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার খরচ বাবদ বছরে ৫ লক্ষ টাকা করে পাবে। এত বড় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প এর আগে এদেশে চালু হয়নি। এমনিতেই গরিব মানুষের জন্য বিগত চার বছরে অনেক কাজই সরকার করেছে। ভরতুকিতে রেশন পাচ্ছে গরিব মানুষ। এছাড়াও গ্রামে রাস্তা এবং শৌচালয় নির্মাণ, বৈদ্যুতিকরণ— এসবের কাজ তো চালু রয়েছেই। আমরা চেষ্টা করছি প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয় নির্মিত হোক, গ্যাস সংযোগ পৌঁছে যাক। এ কাজে ৫৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। এসবের সঙ্গেই যোগ হলো দরিদ্রতম মানুষদের জন্য হেলথ কেয়ার স্কিম। গরিব মানুষ তাদের অভিভাবক হিসাবে এই সরকারকে দেখতেই পারেন।

এক্ষেত্রে আপনারা একটা প্রশ্ন করতেই পারেন— এই যে হেলথ কেয়ার চালু করা হচ্ছে— এর অর্থসংস্থান কোথা থেকে হবে। এ বিষয়টিও আমরা ভাবনা-চিন্তা করে রেখেছি। অতিরিক্ত সেস আদায় করে এবং ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের মাধ্যমে এই অর্থের সংস্থান করার কথা আমরা ভেবে রেখেছি।

(প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত)

এই সময়

অ্যাবিবাবুর প্রত্যাবর্তন

'অ্যাবি একটি কুকুরের নাম। তার মালিক পেনসিলভিনিয়ার ডেবরা সুয়েরভিল্ড। অ্যাবি

হারিয়ে গিয়েছিল দশ বছর আগে। ডেবরা তার প্রিয় পোষ্যের কোনও খোঁজ না পেয়ে ধরে নিয়েছিলেন সে আর বেঁচে নেই। কিন্তু সম্প্রতি সে নিজেই রাস্তা চিনে ফিরে এসেছে। অভাবনীয় কাণ্ডে সবাই খুশি।

মায়ের কন্যাদান

চেন্নাইয়ের রাজেশ্বরী শর্মার ডিভোর্স হয়ে গেছে অনেকদিন। প্রাক্তন স্বামী কোনও খোঁজ

রাখেন না। এই অবস্থায় একমাত্র মেয়ের বিয়েতে কন্যাদান কে করবেন তাই নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। শেষে এগিয়ে আসেন রাজেশ্বরী নিজেই। তাঁর যুক্তি, মেয়ের বাবা এবং মা— দুই ভূমিকাই তিনি পালন করেছেন। তা হলে কন্যাদানে অসুবিধে কোথায়?

হিন্দুমতে

একজন ভারতীয়ের সঙ্গে বিদেশিনীর বিবাহ নতুন কোনও খবর নয়। কিন্তু বিয়েটা যদি হয়

সম্পূর্ণ হিন্দুমতে, সমস্ত সাবেক আচার অনুষ্ঠান মেনে— তাহলে? চেন্নাইয়ের সুব্রহ্মণি এবং ইতালির ফ্লাবিয়া গিউলিয়ানেলির বিয়ে হয়েছে হিন্দুমতে।

থ্রি টি : ট্রেড টুরিজম এবং ট্রেনিং

ত্রিপুরায় আমাদের লক্ষ্য থ্রি টি অর্থাৎ ট্রেড, টুরিজম এবং ট্রেনিংয়ের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। বক্তা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত একটি জনসমাবেশে ভাষণ দেবার সময় তিনি একথা বলেন। নরেন্দ্র মোদীর অতুলনীয় বাগ্মিতায় মুগ্ধ হন লক্ষাধিক মানুষ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ত্রিপুরার মানুষ উন্নয়নের

স্বাদ পেতে চান। এখানকার যুবক-যুবতীরা চাকরির সুযোগ চায়।' বাম আমলে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'এবারের নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষ নিজেদের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য লড়াই করবেন। বাম নেতারা তাদের পরিচ্ছন্ন পোশাকের আড়ালে যেসব দুর্নীতি লুকিয়ে রেখেছেন তাই নিয়ে প্রশ্ন করবেন মানুষ।'

সুষমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন

'প্রতি বছর ভারত থেকে অজস্র মানুষ হজ এবং উমরাহ্ পালন করার জন্য সৌদি আরবে যান। ভারতীয় হজযাত্রীদের কোটা বাড়াবার জন্য আমি সৌদি আরব সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।' সাম্প্রতিক সৌদি আরব সফরে এভাবেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। প্রত্যুত্তরে সৌদি আরব প্রশাসনও সুষমাকে সম্মাননীয় অতিথি

হিসেবে বর্ণনা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সৌদির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুষমা স্বরাজ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে গেছেন। এটি সমগ্র আরব দুনিয়ার বৃহত্তম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দু' সপ্তাহ ধরে এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উৎসব চলে। সুষমা বলেন, 'ভারত এবং সৌদি আরবের সম্পর্ক বহু প্রাচীন। কয়েক শতাব্দী ধরে আর্থ-সামাজিক নানা বিষয়ে মত-বিনিময়ের মাধ্যমে দু' দেশের মানুষ এই সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

এই সময়

পুলিশি বিড়ম্বনা

স্কটল্যান্ডের অ্যাকর্ডিনশায়ার থেকে ফোন এল স্থানীয় থানায়। কেউ একজন বললেন, 'শীগগির ফোর্স পাঠান। আমার বাগানে বাঘ

ঢুকেছে।' বিশাল পুলিশবাহিনী বাগান ঘিরে ফেললেও ৪৫ মিনিট বাঘের কাছে যাবার সাহস পায়নি। যখন পেল জানতে পারল ওটা খেলনা বাঘ।

নিজের ঢাক

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিজের কর্মক্ষেত্রকে ব্যবহার করার এরকম উদাহরণ বড়ো একটা পাওয়া যায় না। পাকিস্তানের সিটি ৪১

চ্যানেলের সাংবাদিক হানান বুখারি তার বিয়ের খবর ফলাও করে চ্যানেলে প্রচার করেছেন। নিয়েছেন সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর সাক্ষাৎকারও।

তিনজন

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সাহায্য আগেই কাটছাঁট করে আমেরিকা। এবার তিন

সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গি নেটওয়ার্কের যোগাযোগ থাকার অভিযোগে তাদের গ্লোবাল টেররিস্ট ঘোষণা করল। এদের নাম রহমান জেব ফকির মহম্মদ, হিজারউল্লার আসতম খান এবং দিলওয়ার খান।

নাগরিকপঞ্জীতে শুধু ভারতীয়রা থাকবেন

সম্প্রতি জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ আহির রাজ্যসভায় বলেন, 'অসমে যেসব বৈধ ভারতীয় নাগরিকেরা রয়েছে শুধুমাত্র তাদের নামই জাতীয় নাগরিকপঞ্জীতে তোলা হবে।' প্রশ্ন করেছিলেন কংগ্রেসের রিপন বরা। মন্ত্রী জানান, সর্বোচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধানে নাগরিকপঞ্জী তৈরির কাজ চলছে। ৩১ ডিসেম্বর ৩.২৯ কোটি আবেদনকারীর মধ্যে ১.৯০ কোটি নাগরিকের নাম-সংবলিত একটি খসড়াপঞ্জী প্রকাশিত হয়েছে। যাদের ভেরিফকেশন-পর্ব শেষ হয়েছে একমাত্র তাদেরই নাম আপাতত তালিকায় উঠেছে। অবশিষ্ট আবেদনকারীর ভেরিফিকেশন শেষ হলে বিভিন্ন ধাপে নতুন খসড়াপঞ্জী প্রকাশিত হবে। নাগরিকত্ব (রেজিস্ট্রেশন অব সিটিজেনস অ্যান্ড ইস্যু অব ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ডস) বিধি, ২০০৩ মেনে পঞ্জীকরণের কাজ চলছে।

গ্রামে উপগ্রহ প্রযুক্তির প্রয়োগ

উপগ্রহ প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রামীণ ক্ষেত্রের সর্বাত্মক উন্নয়নের জন্য ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ৪৩৭টি গ্রাম সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র খুলেছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ১৮ কোটি টাকা। সম্প্রতি এই খবর দিয়েছেন পরমাণু বিকাশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড.

জিতেন্দ্র সিংহ। কয়েকটি এনজিও-র সঙ্গে যৌথভাবে ইন্ডিয়ান রিসার্চ অর্গানাইজেশন গ্রামসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি খুলেছে। এই উদ্যোগে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছে কয়েকটি ট্রাস্ট এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির কিছু দপ্তর। টেলি হেলথকেয়ার, টেলি এডুকেশন, জাতীয় সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার, কৃষি-সংক্রান্ত পরামর্শ, গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পেশা নির্দেশ ইত্যাদি পরিষেবা গ্রামসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাবে।

পৃথ্বী-২

পৃথ্বী-২ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে। ওড়িশার চাঁদিপুর সমুদ্রশহরের হুইলার দ্বীপ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। পরমাণু শক্তিচালিত এই ক্ষেপণাস্ত্র

এই সময়

অসমে সি. ভি. রমন

সম্প্রতি অসম সরকার এ আই এস ই সি টি গ্রুপ অব ইউনিভার্সিটিজের সঙ্গে ৩০০ কোটি

টাকার মউ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উদ্দেশ্য, গুয়াহাটিতে শীঘ্রই সি.ভি. রমনের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা। উল্লেখ্য, এ আই এস ই সি টি গ্রুপ সারা দেশে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে।

উজ্জ্বলা যোজনা

দারিদ্র্যসীমার নীচে যারা বসবাস করেন তাঁরা যাতে আরও বেশি সংখ্যায় রান্নার গ্যাসের

সংযোগ পান তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার লক্ষ্যমাত্রা ৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৮ কোটি করেছে। এর জন্য সরকারের অতিরিক্ত ৪,৮০০ কোটি টাকা খরচ হবে।

অচ্ছে দিন

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, ঘরে ঘরে হাসি। অচ্ছে দিনের পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সারা দেশের

৭৮.২৪ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। ভারতে গরিব মানুষের বাড়ির সংখ্যা ১৮.১০ কোটি। যার মধ্যে ১৪.১৬ কোটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

৫০০ কেজি থেকে ১০০০ কেজি পর্যন্ত ভারবহনে সক্ষম। ৩৫০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে যে-কোনও লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে পৃথ্বী। ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ডি আর ডি ও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

অর্গানাইজেশন) এই প্রথম এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করল। উল্লেখ্য, অগ্নি-১ এবং অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রের পর পৃথ্বী-২-এর সফল উৎক্ষেপণ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তুলল। পৃথ্বী-২-এর দৈর্ঘ্য ৯ মিটার।

অন্ধজনের ক্রিকেট

খুব কম মানুষই জানেন ভারতে এমন একটি ক্রিকেট দল রয়েছে যার প্রত্যেক সদস্যই অন্ধ। শুধু তাই নয়, অন্ধ এবং ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন ক্রিকেটারদের একটি বিশেষ বিশ্বকাপ আয়োজন করে আইসিসি। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট দল এই বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে তারা পাকিস্তানকে দু'উইকেটে হারিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো অন্ধদের

ক্রিকেট সংগঠন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ইন্ডিয়াকে এখনও পর্যন্ত অনুমোদন দেয়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভারতের মাস্টার-ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর। বোর্ডকে অনুরোধ করে লিখেছেন, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দা ব্লাইন্ড ইন ইন্ডিয়াকে অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে যেন ভাবনাচিন্তা করেন কর্তারা। অন্ধ ক্রিকেটারদের বোর্ডের পেনসন প্রকল্পের আওতায় আনার কথাও তিনি বলেছেন।

ভারতীয় ভাষায় লিখিত রত্নভাণ্ডারসম গ্রন্থরাজি বিশ্বের দরবারে পৌঁছনোর অধিকারী

অতিথি কলম

পবন কে ভার্মা

২০০৪ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমির সুবর্ণজয়ন্তী সমারোহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কারণে আমার নজরে এসেছিল দেশে সাহিত্যচর্চার এই সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যই হলো দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ভাষায় সৃষ্টিশীল লেখালেখিগুলির পারস্পরিক প্রচার ও প্রসার বাড়ানো এবং প্রয়োজনে পুরস্কৃত করা। তৎকালীন সংস্থা সচিব ও মালয়ালাম ভাষার প্রসিদ্ধ কবি সৎচিদানন্দন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ ইংরেজিতে রেখেছিলেন।

যোগাযোগমন্ত্রী বিহারের মানুষ শাকিল আহমেদ একটি অত্যন্ত ক্লান্তিকর ভাষণ ইংরেজিতে পাঠ করেন। তৎকালীন সংস্কৃতিমন্ত্রী জয়পাল রেড্ডির মুখশ্রাব্য হলেও— তাও ছিল ইংরেজিতেই। সংস্থার সহসভাপতি বাংলা ভাষার বিখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর ভাষণ ইংরেজিতেই দিয়েছিলেন। কেবল সংস্থার সভাপতি গোপীচাঁদ নারাং তাঁর ভাষণ উর্দুতে দেন। শুনলে অবাক হবেন, এই উপলক্ষে সংস্থা যে বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল তাঁর অক্ষরগুলিও ছিল কেবলমাত্র ইংরেজিতেই।

ঘটনাটা আমার মনে পড়ল, কেননা আমি অতি সম্প্রতি কলকাতা ও জয়পুরে অনুষ্ঠিত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য উৎসবে যোগ দিয়ে ফিরেছি। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি এবারে কিন্তু আমি দু'জায়গাতেই আমাদের দেশীয় ভাষাগুলিকে তুলে আনার বিষয়ে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়াস দেখেছি। কলকাতার ক্ষেত্রে বহু অধিবেশন বাংলাতেই পরিচালিত হয়েছিল আর সেটাই তো হওয়া উচিত। জয়পুরে ভারতের নানা ভাষার লেখকরা ছিলেন মধ্যমণি। সজ্ঞানে জেনে বুঝে এইভাবে দেশীয় ভাষাকে উৎসাহ দেওয়াই তো একান্ত কাম্য। অবশ্যই, জয়পুরে বহু বিদেশি লেখকদের সমাগম হয়েছিল। একই সঙ্গে এটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, একথা মানতেই হবে আমাদের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে কয়েক শতাব্দী এমনকী সহস্রাব্দ ধরে যে বিভিন্ন ভাষার চর্চা ও বিকাশ জারি ছিল তার প্রমাণ হিসেবে রয়েছে অতি উন্নতমানের পাণ্ডুলিপি, কথ্যভাষার সম্ভার, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য উপকরণ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও এই অমূল্য সম্পদগুলি রয়ে গেছে ইংরেজি ভাষার ছত্রছায়ায়। আমার ইংরেজি ভাষার বিরোধিতা করার কিন্তু কোনও কারণ নেই। বহু শতাব্দী ধরে ঐতিহাসিক কারণেই এই ভাষা সারা বিশ্বে বহুকথিত এবং আজকের বিশ্বায়নের যুগে পারস্পরিক কথাবার্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য সকলক্ষেত্রেই ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভাষাকে কখনই সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ বিস্তারের অপরাধে অপরাধী করা যায় না। অপরাধী তারাই, যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এটিকে ব্যবহার করে।

ইংরেজি শেখা কাম্য, কিন্তু এটিকে শিখতেই হবে এমন একটা মরিয়াভাব পোষণ করা হলে আমরা হয়তো আমাদের নিজস্ব ভাষাগুলিকে অবহেলার মুখে ঠেলে দেব। প্রসিদ্ধ নাইজেরিয়ান লেখক নগুসি ওয়া থিংগো চমৎকার ভাবে এ সংক্রান্ত আলোচনার ভিত্তিভূমি তৈরি করেছেন। তিনি ভাষার দু'টি চরিত্রের কথা বলেছেন। প্রথমত, এটি কথ্য যোগাযোগের বাহন। দ্বিতীয়ত, ভাষা সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের বাহক। হাতে গোনা কিছু ভারতীয় লেখক যাঁরা ইংরেজি ভাষাকে তাঁদের প্রথম ভাষা হিসেবে ধরে

“কুশলী অনুবাদকদের একটি দল তৈরি খুবই জরুরি, যাতে করে দেশের মানুষ ভারতের নানা ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পড়ার সুযোগ পায়। এর অন্যথায় এই ধরনের সাহিত্য উৎসবগুলি এক ধরনের সাহিত্যিক অস্পৃশ্যতারই শুধু জন্ম দেবে। যেখানে কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার (আমাদের দেশের) লেখকরাই লাঠি ঘোরাবেন, বাকিরা শুধু নীরব দর্শক বা এই প্রথার বলি হিসেবেই থেকে যাবেন।”

ইংরেজিতেই ভারতীয় জীবন কাহিনির চর্চা করেন তাঁদের বাদ দিলে বিশাল ভারতের গরিষ্ঠতম জনগোষ্ঠী কাছে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষাই হতে পারে সাংস্কৃতিক অনুভবের বিশ্বাসযোগ্য বাহন।

মাতৃভাষাগুলিতেই সংরক্ষিত থাকে— আমাদের চিরায়ত লোককথাগুলি, আমাদের ঘুমপাড়ানি গান, আমাদের প্রবাদবাক্যের ভাণ্ডার, আমাদের মুখে মুখে চলা কথকতা, পাঁচালির গ্রামীণতা বা অতিকথন বা লিজেন্ডগুলির মাহাত্ম্য। সত্যি কথা বলতে কী গালাগাল দিতে গেলে তো আমরা প্রথমেই মাতৃভাষাটিকেই সুযোগ দিয়ে থাকি।

অধ্যাপক ও ভাষাতাত্ত্বিক নামওয়ার সিং বলেছেন, যে কোনও ভাষাই অন্য একটি ভাষার যথার্থ বিকল্প কখনই হতে পারে না। কল সেন্টারে যে ইংরেজি বলা হয় তা দিয়ে কোনও ভাষা শিক্ষা হয় না। আমাদের নিজেদের ভাষাতেই জ্ঞান চর্চা বাড়াতে হবে। ভাষাকে যখন সংস্কৃতির বাহনের সম্মান দেওয়া হয় না তখনই তার প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা শুরু হয়। বিশ্বখ্যাত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেলডন পেলিক কয়েক বছর আগে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষাগুলির ভাণ্ডারে শুধু আগুনই লেগে যায়নি এই সম্পদ পুড়ে প্রায় ছাই হতে বসেছে'। তিনি আরও বলেন অন্তত ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এবং তার বহু শতাব্দী আগে তো বটেই— ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতে যে ধরনের পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছিলেন তাঁরা সমগ্র বিশ্বেরই সমকক্ষ। এই প্রাজ্ঞ পণ্ডিতরা কন্নড়, মালয়ালম, তামিল, তেলুগু, ব্রজভাষা, বাংলা, ওড়িয়া, সংস্কৃত, মারাঠি প্রভৃতি নানান ভারতীয় ভাষায় অমূল্য সব কোষগ্রন্থ লিখে গেছেন যেগুলির ওপর চোখ বোলালেই আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যায়।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত বেশ কয়েক দশক ধরে এই সাহিত্যিক রত্নভাণ্ডারে নিয়ে কোনও কাজই হয়নি। একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, একটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় তেলুগু চর্চার জন্য সেই ভাষা সাহিত্য ও প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে সুপণ্ডিত একজন ব্যক্তির সন্ধান করেও পায়নি। উপযুক্ত নিযুক্তির অভাবে আমাদের ভাষা নিয়ে তাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগটিই বন্ধ করে দিয়েছে।

আজকের দিনেও ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলিতে অসাধারণ সব মননশীল লেখালিখি চলছে, কিন্তু বহু ভাষাভাষিক অনুবাদক তৈরির কোনও চেষ্টাই যেহেতু সরকারি স্তরে হয়নি এবং ইংরেজি রূপান্তরের ক্ষেত্রেও অনুবাদক তৈরি হয়নি তাই এই অত্যন্ত বহুল প্রচারযোগ্য লেখাগুলি কেবলমাত্র সেই ভাষার বদ্ধ জলাশয়ের গণ্ডিতেই আবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ এগুলি দেশের অভ্যন্তরে তো বটেই আন্তর্জাতিক পরিসরেও বহুল প্রচার দাবি করে। উল্টোদিকে, নিয়তির পরিহাসে অতি সাধারণ মানুষের ইংরেজিতে লেখা বই অনায়াসে সারা ভারতব্যাপী প্রচার ও পাঠক পেয়ে যায়।

আমাদের নীতি প্রণয়ন কর্তাদের ও বিভিন্ন সাহিত্য উৎসব আয়োজক কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। আমরা ইংরেজি ভাষাকে সে অর্থে কখনই বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারি না। সে অর্থে বলতে যেখানে কেবলমাত্র উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ও ঝরঝর করে ইংরেজি কথাবার্তা বলতে পারাটাকেই মেধার সর্বোচ্চ স্তর বলে ধরা হয়। এই সূত্রে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে প্রত্যেক প্রদেশের স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের শুরুর দিকের বছরগুলিতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় মাধ্যমেই শিক্ষাদানে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। একই সঙ্গে কুশলী অনুবাদকদের একটি দল তৈরি খুবই জরুরি, যাতে করে দেশের মানুষ ভারতের নানা ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পড়ার সুযোগ পায়। এর অন্যথায় এই ধরনের সাহিত্য উৎসবগুলি এক ধরনের সাহিত্যিক অস্পৃশ্যতারই শুধু জন্ম দেবে। যেখানে কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার (আমাদের দেশের) লেখকরাই লাঠি ঘোরাবেন, বাকিরা শুধু নীরব দর্শক বা এই প্রথার বলি হিসেবেই থেকে যাবেন। সত্যি হবে গান্ধীজির ভবিষ্যদ্‌বাণী যখন আমরা হয়তো বুঝতে শুরু করব আমরা আমাদের মহান ভাষাগুলিকে অবহেলা করে নিজেদের কী ক্ষতিই না করেছি।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও রাজ্যসভার সদস্য)

চিঠিপত্র

‘দুষ্টু স্যার’

স্বস্তিকার ৮.১.১৮ তারিখে প্রকাশিত সব ‘চিন্তামূলক’ প্রবন্ধগুলির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এগুলির মধ্যে ১৯ পাতার সন্দীপ চক্রবর্তীর লেখা ‘‘বাংলা অভিধানে নতুন শব্দবন্ধ ‘দুষ্টু স্যার’ নিবন্ধটির কয়েকটি ছত্র আমার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি লিখেছেন— ‘‘এমনিতেই বাঙালির ইংরেজিপ্রীতি সর্বজনবিদিত। অবশ্য সেই ইংরেজি শুধু একটি ভাষা নয় কালচার— যার নাম ইংরেজিয়ানা। কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি শহরের ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলি আসলে ইংরেজিয়ানা শেখার ছাঁচ। বাঙালি শিশু তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে কিছুদিন হাত পা ছোঁড়ে, তারপর পুরোদস্তুর বিশ্বনাগরিক বনে যায়।’’ —এক্কেবারে ঠিক কথা, মনের মতো কথা। কথাগুলো আমাদের ভাবায়। লোকে ইংরেজি শিখুক, একটা বিদেশি ভাষা শিখুক, আপত্তি নেই। কিন্তু নিজের ভাষাকে অবহেলা করা কেন? যখন সে ভাষা পৃথিবীর অন্যতম একটা শ্রেষ্ঠ ভাষা? আজকাল দেখতে পাচ্ছি কম লেখাপড়া জানা বা লেখাপড়া না জানা লোকেরাও ‘বাবু-সাহেবদের’ দেখাদেখি কেমন ইংরেজি শব্দমিশ্রিত বাংলাভাষায় কথা বলছে। পরীক্ষা করে দেখেছি যে তারা জানেও না ওটা বাংলা নয়। যেহেতু বাবুরা বলে, তাই বলছে। যেন ওটাই ভদ্র ভাষা। তাই স্বামীকে ‘হ্যাজব্যান্ড’, স্ত্রীকে ‘ওয়াইফ’, মা-কে ‘মম’, কাকিমা, পিসিমা, মামিমা, সবাইকে ‘আন্টি’; কাকাকে ‘আঙ্কেল’, খরিদারকে ‘কাস্টমার’ ইত্যাদি সমস্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদগুলি, এমনকী ‘কিন্তু’, এবং ‘প্রভৃতি’ অব্যয় পদগুলির বদলেও ইংরেজি কেমন অবলিলাক্রমে বাংলায় ঢুকে গেছে। শুনলে মনে হয় কানে যেন গরম সিসা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এভাবেই আমাদের প্রিয় মাতৃভাষার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হচ্ছে যে, সে কথাটা কি বাংলাভাষীরা চিন্তা করবে না?

আসলে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদরা এরকমই চেয়েছিল আর তাই হয়েছে। কত সুদূরপ্রসারী ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি! তাই স্বাধীনতার এত বছর পরও ইংরেজিয়ানার প্রতি বাঙালির এত মোহ। মেকলে সাহেব চেয়েছিল ভারতীয়ারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে শিখুক, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে শুরু করুক আর তাহলেই সেই স্বাভিমানহীন জাতিকে পদানত করে এই দেশে কায়েমি হয়ে বসা যাবে। সেই ব্যক্তির দুষ্টবুদ্ধি কার্যকরী হয়েছে। তাই তারা আজ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও দেশে মিশনারি পরিচালিত বিদেশি ভাবধারাপুষ্ট স্কুলগুলির এত বাড়বাড়ন্ত। শহুরে অভিজাত বাবুদের প্রভাব, চিত্রতারকা ও ক্রীড়া তারকাদের অনুকরণে না জেনে, না বুঝে সকলেই বাংলার বদলে ‘বাংরেজি’ বলতে শুরু করেছে। নিজের ভাষায় ভালো প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও আমরা কথার মধ্যে অযথা পরের ভাষা ব্যবহার করতে লজ্জা অনুভব করছি না। আর ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী যেমন ব্যবহারের অভাবে বা অতি ব্যবহারে জীবদেহের বিকৃতি হয়েছে, সেই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের ভাষাও বিকৃত হয়েছে বা হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে বাংলা ভাষায় যাঁরা কাজ করেন সেই সব ব্যক্তি অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, সাংবাদিকরা, সাহিত্যিক চিন্তা করেন কিনা, ভাষার অপমৃত্যুতে তাঁরা ব্যথিত হন কি না— জানার ইচ্ছে হয়। তাঁরা কি ভাবেন না— এই অন্ধ-অনুকরণ প্রবণতাকে স্বামী বিবেকানন্দ কত তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে গেছেন?

—প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
পাটুলি, কলকাতা-৯৪।

ভারতের অখণ্ডতা ও হিন্দু সংস্কৃতি

অনেকে ভাবেন যে এই হিন্দুধর্ম তথা সনাতনধর্ম যত অত্যাচারই হোক না কেন ভগবানের কৃপায় ধ্বংস হবে না, টিকে থাকবে। এদের জ্ঞাতার্থে বলি— বেশিদিনের কথা নয়, হাজার বছর আগে আফগানিস্তান হিন্দুরাষ্ট্র ছিল। গান্ধারী আফগান তথা কান্দাহার কন্যা। আফগানিস্তানে শেষ হিন্দুরাজা ছিল শাহিবংশ। সুলতান মামুদের আমলে ইসলামিকরণ হয়। তারপর প্রায় ২০০ বছর হিন্দু সংস্কৃতি টিকে ছিল। তারপর কুতুবুদ্দিন আইবক যখন দিল্লিকে স্থায়ী রাজধানী করে, তখন আফগানিস্তান ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তী ৩২০ বছর আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। ৩০০ বছর ধরে প্রায় ১৫ প্রজন্ম হিন্দু সংস্কৃতি ভুলে গেছে বা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে শরিয়তি শাসনে। ইরান একটি হিন্দুরাষ্ট্র ছিল, তাঁরা সূর্যের পূজারি ছিল। জরুথুস্ট মুনির অনুগামী। আজ সেখানে ইসলামি কালচার। পাকিস্তান ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় হিন্দুশূন্য, সেখানে হিন্দু সংস্কৃতি অবলুপ্তির পথে। আরব দেশও মূর্তি পূজকের দেশ ছিল অর্থাৎ হিন্দু ছিল। মুসলমানদের মুখেই শুনি কাবা মসজিদে এখনও নাকি শিবলিঙ্গ বর্তমান। আজ সেটা ইসলামের পীঠস্থান। বাংলাদেশও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ৪০ শতাংশ হিন্দু থেকে ৭ শতাংশ নেমেছে। বালি, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে হিন্দু প্রায় অবলুপ্তির পথে। ভারতবর্ষে শত অত্যাচার সত্ত্বেও হিন্দু টিকে থাকতে পেরেছে কারণ হিন্দুদের কয়েজনের নির্ভীকতা ও হিন্দুদের পীঠস্থান বলে। এটাও সম্ভব হয়েছে ১৭৫৭ সাল থেকে ব্রিটিশের অধীনে আসার ফলে। আজও যদি মুসলমান শাসন থাকত তবে ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম লোপ পেয়ে যেত। সেজন্য গোঁড়া মুসলমান ও মৌলবিদের ব্রিটিশের উপর রাগ। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই হিন্দুরা জমিদার, ব্যবসাদার সংস্কৃতি সম্পন্ন হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। কলিকাতা নগরীর পত্তন হওয়াতে হিন্দুরা সুশাসনের আশায় কলিকাতামুখী হয়। ইংরেজরাও কম অত্যাচারী ছিল না। তবে তারা আইনের শাসন মেনে চলত। তখন সারা দেশে একটা নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থা প্রায়

১৯১৪/১৫ সাল বিরাজমান ছিল। গান্ধীজী ও ধর্মান্তরিত নেহরুর আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের অনুগামী হয়ে গেল। যাইহোক, ২০১৪ সালের পর আবার একটা জাগরণ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তবে এত ধান্ধাবাজ, সুযোগসন্ধানী, মাষুষ তৈরি হয়েছে তাতে এই জনজাগরণ থাকবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে। সুতরাং এই জনজাগরণ, জাতিপ্রীতি যদি থাকে তবেই মঙ্গল। যদি আমরা সোনার ডিম পাওয়ার আশায় হাঁসটিকে মেরে ফেলি তবে আমাদের কপালে দুর্ভোগ আছে। তখন আর চিন্তা করার সময় ও ক্ষমতা দু'টিই থাকবে না।

—**কমল কুমার মুখোপাধ্যায়,**
চুঁচুড়া, হুগলী।

পাকিস্তানের হুমকি

কয়েকমাস আগে শেখ আবদুল্লা-পুত্র ওমর আবদুল্লা সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মোদী সরকারের উদ্দেশে বলেছেন, কাশ্মীর নিয়ে ভারত সরকার আর কতদিন ছিনিমিনি খেলা খেলবে। আর কতদিন তারা পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে তাদের বলে দাবি করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলবে। যদি এই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর সত্যিকারেই তাদের হয়, তবে কেন তারা পাকিস্তানের কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিচ্ছে না। তিনি আরও হুমকি দিয়ে পাকিস্তানের সুরে বলেছেন ভারতের নিশ্চই ১৯৬৫ সালের কার্গিল যুদ্ধের কথা মনে আছে। তবে আজ আর পাকিস্তান সেই পুরনো অবস্থায় নেই। আজ তাদের হাতে আছে পরমাণু অস্ত্র। এই কথাটা ইতিপূর্বে পাকিস্তানও ব্যবহার করে ভারতকে ভয় দেখিয়েছে।

সার্বভৌমত্বের উপর এত বড় চ্যালেঞ্জ সত্যিই কি দেশের অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে লজ্জাজনক নয়? যে দেশের জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেকেও কম, তাদের এই চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে খুবই লজ্জাজনক নয় কি? অতএব এর বিহিত একটা হওয়া এখনই দরকার।

—**পাঁচুগোপাল ঘোষ,**
মুন্সিরহাট, হাওড়া।

ভারতীয় ডাকটিকিটে স্বামী প্রণবানন্দ

স্বামী প্রণবানন্দ (২৯ জানুয়ারি, ১৮৯৬—৮ জানুয়ারি, ১৯৪১) একজন হিন্দু যোগী ও মহাত্মা, সনাতনী হিন্দু ধর্মের প্রচারক। তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা (১৯১৭)। এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘটি আর্ত-পীড়িত মানুষের জন্য এবং তীর্থ সংস্কারের কাজে ব্যাপৃত; ধর্ম ও কর্মচক্রের পুনঃপ্রবর্তক। ২০০২ সালের ৩ নভেম্বর ৫০০ পয়সা দামের একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে ভারতীয় ডাকবিভাগ। তাতে ডানদিকে স্বামী প্রণবানন্দের আবক্ষ রঙিন ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বাঁদিকে হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও তার উপর-নীচে সেবামূলক কাজের দুটি চিত্র আঁকা। তলায় ডানদিকে হিন্দিতে ও ইংরেজিতে লেখা Swami Pranavananda।

তিনি মানব জীবনের মহালক্ষ্য রূপে আত্মতত্ত্বোপলব্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না; আত্মবিবেক যদি চলে যায় তবে তা মহামৃত্যুর সমতুল্য। বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব এবং মুমুক্ষত্বই হচ্ছে মহাপুণ্য এবং সারাজীবন তারই অধ্যবসায় করে যেতে হবে। দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সংকীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা কাটিয়ে ভারতবাসীকে এগিয়ে যেতে হবে।

—**ড. কল্যাণ চক্রবর্তী,**
কল্যাণী, নদীয়া।

বানিয়া ব্যারিস্টার

স্বাধীনতা লাভের পরে কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছিলেন গান্ধীজি। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ ছত্তিশগড়ে গত ১০ জুন লেখক, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এক আলোচনাসভায় গান্ধীজির ওই কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন— গান্ধীজি চতুর বানিয়া ছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস টিকে গেলে কি হতে পারে। তাই তিনি ওই কথা বলেছিলেন। 'বানিয়া' কথাটি নিয়ে গান্ধী-অনুরাগী মহলে প্রতিবাদের বন্যা বয়ে যায়। গান্ধীজির পৌত্র গোপালকৃষ্ণ গান্ধী 'বানিয়া' কথাটি অরুচিকর বলে মন্তব্য করেন, অপর এক পৌত্র, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রাজমোহন গান্ধী বলেন— মহাত্মা গান্ধীকে 'বানিয়া' বলা অসম্মানজনক।

২৬ নভেম্বর, ২০১৭ 'দি টেলিগ্রাফ' দৈনিকে গোপালকৃষ্ণ গান্ধী 'Godhra a hundred years ago and now' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লিখেছেন। বিষয়বস্তু, ১৯১৭ সালের নভেম্বরে গান্ধীজীর উদ্যোগে গোধরায় অনুষ্ঠিত 'গুজরাটি পলিটিক্যাল কনফারেন্স'। ওই কনফারেন্সে তিলক, জিন্না, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সে সময়ের পরিচিতি প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ বলেছেন— গান্ধীজি তখন মহাত্মা হননি, গুজরাটিদের কাছে সে সময় গান্ধীজির পরিচয় ছিল— মোধ বানিয়া ব্যারিস্টার ('Gandhi was most surely indentified by that Gujrat Congregation as a Modh Bania barrister.)' কাজেই দেখা যাচ্ছে, অমিতজি নতুন কথা কিছু বলেননি।

গান্ধীজি তাঁর 'আত্মকথা'য় ('My Experience with truth') বলেছেন--- 'গান্ধীরা জাতে বানিয়া'।

আকর প্যাটেল ৩.৭.১৭-র স্বস্তিকাতে গুজরাটি বানিয়াদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন, বলেছেন--- 'গুজরাটিদের কাছে 'চুতর বানিয়া' সম্বোধন আদৌ অপমানজনক নয়। অমিত শাহ নিজেও জৈন সম্প্রদায়ের বানিয়া, আর গান্ধী ছিলেন বৈষ্ণবপন্থী বানিয়া'। উভয়েরই সামাজিক পরিচয় বানিয়া। কথাটি কুরুচিকর এবং অমিত শাহ গান্ধীজীকে 'বানিয়া' বলে অসম্মান করেছেন, এই অভিযোগ বলা বাহুল্য অজ্ঞতা ও অন্ধ বিজেপি-বিরোধিতার সাক্ষ্য বহন করে।

পরিশেষে একটি অনুরোধ। Modh কথাটির অর্থ জানা নেই; ওয়াকিবহাল পাঠক কেউ যদি তা জানান, উপকৃত হব।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

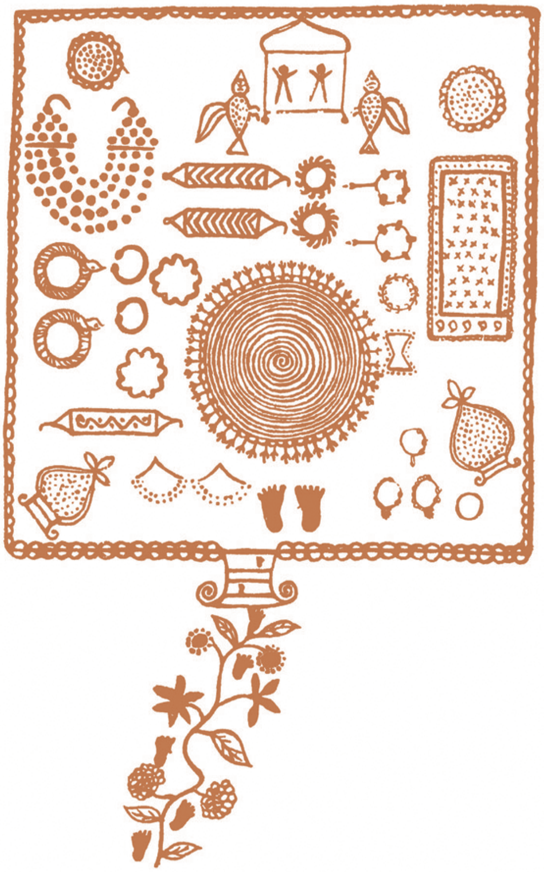

সূর্যোপাসনামূলক কুমারীব্রত

মাঘমণ্ডল

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

সাবেক পূর্ববঙ্গে প্রচলিত এবং প্রতি মাঘ মাসে পালিত পাঁচ বছর ব্যাপী সূর্যোপাসনা মূলক একটি কুমারীব্রত হলো মাঘমণ্ডল। এই ব্রতের দুটি মূল কৃত্য হলো পঞ্চগুঁড়ির রঙিন আলপনা অঙ্কন এবং ‘বারৈল’ বা ‘লাউল’ নামক মৃত্তিকা-প্রতীক নির্মাণ, ফুল-দূর্বা দিয়ে তার সাজসজ্জা ও পূজন।

এই ব্রতে আঙ্গিনায় অঙ্কিত হয় ব্রতমণ্ডল; তার উপরে গোলাকার সূর্য আর নীচে অর্ধচন্দ্র বা চন্দ্রকলা; মাঝে অয়ন-মণ্ডল। অয়ন-চিহ্নের সংখ্যা দ্বারা উপলব্ধ হয় ব্রতের পূর্ণতার বছর। ‘আমার মা’র বাপের বাড়ি’ গ্রন্থে রানী চন্দ লিখছেন, ‘‘এক বছরে এক গোলের আলপনা, দু’ বছরে দু’ গোলের। এক গোলের গায়ে আর একটি বৃত্ত দাগা...তিন বছরে তিনটি বৃত্ত, চার বছরে চারটি— আর পাঁচ বছরে পরপর রেখা টানা পাঁচটি বৃত্তের প্রকাণ্ড একটা আলপনা’’।

মাঘ মণ্ডলের ব্রতে পিটুলি গোলার আলপনা দেওয়া হয় না, দিতে হয় চালের গুঁড়ির সঙ্গে হলুদ, সিঁদুর, ধানের পোড়ানো তুষ শুকনো বেলপাতার গুঁড়ো মিশিয়ে নানাবর্ণে রঞ্জিত করে রঙিন আলপনা। রোজই দেওয়া হয় এই আলপনা, দু’ আঙুলের টিপে গুঁড়ি নিয়ে আঙুল সামান্য নাড়িয়ে ঝুরঝুর করে ফেলে আঁকা হয় লতাপথ। পৌষের সংক্রান্তি থেকে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে এই ব্রত।

‘হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান’ গ্রন্থে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখছেন, ‘‘প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দূর্বাগুচ্ছের সাহায্যে চোখে ও মুখে জল ছিটাইতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম ‘চউখে মুখে পানি দেওয়া’। সূর্য উঠিলে পাঁচালি গান করিয়া ‘বারৈল’ ভাসান হয়।...বারৈল দুইটিকে ফুল দূর্বা দিয়া সাজাইয়া একখানি ছোটো তক্তার উপর বসাইয়া পুষ্করিণীর জলে ভাসাইতে হয়। ইহার পর মণ্ডলের উপর ফুল দিতে হয়। পাঁচালিতে সূর্যের পূর্বরাগ ও বিবাহের কাহিনি বর্ণিত হইয়াছে।’’

গ্রামের কিশোরীরা কাকভোরে মাথা-ঘাড়ে কাঁথা জড়িয়ে ঘন কুয়াশা ঠেলে তাদের মা কিংবা দিদা-ঠাকুমার সঙ্গে দু’পাশের ঝোপ ছাড়িয়ে, শিশিরে ভেজা ঘাস মাড়িয়ে চলে ঘাটলায়। কে আগে ঘাটে যাবে যেন তার প্রতিযোগিতা চলে। জলের কাছে ঘাটে রাখা হয় বারৈল বা লাউল। তার সর্বাঙ্গ অতসী, টগর, কলকে, গাঁদা অথবা নানান বুনো ফুলে ঢাকা, কারণ তার পা দেখা গেলেই দোষ। আগের রাতে সাজিয়ে রাখা হয় এই বারৈল।

পরম্পরা

কিশোরীরা একসঙ্গে সুর করে গায় ব্রতের ছড়া; সূর্যকে স্বাগত জানানোর মন্ত্র, ‘‘উঠো উঠো সূর্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া, /না উঠিতে পারি মোরা শিশিরের লেইগা।’’ সূর্য উঠবেন, তাই তার পথ প্রশস্ত করতে কিশোরীরা সাজির ফুল জলে ছুঁড়ে সুর করে গায়, ‘‘খুয়া ভাঙি খুয়া ভাঙি অ্যাচলার আগে,/সকল খুয়া গেল বড়ই গাছটির আগে।’’ ধীরে ধীরে বড়ই বা কুলগাছের মাথা পরিষ্কৃত হয়ে কুয়াশা দূরীভূত হয়, সূর্য ওঠে, তার আলোকিত করুণায় পৃথিবী সচল হয়। ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’ গ্রন্থে স্বামী নির্মলানন্দ লিখছেন, ‘‘তিনি উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতি, সুরি, তিলি, মালী সকলকে জাগিয়ে তোলেন, সকলের গৃহই তিনি আলোকিত করেন, তখন প্রত্যেক নিজ নিজ কর্তব্যে ব্রতী হয়— সমগ্র জগৎ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে। ব্রাহ্মণ বধূ উপবীত, তন্তুবায় বধূ বস্ত্র, কর্মকার বধূ মাল্যাদি

সরবরাহে ব্যস্ত হয়। ব্রতের ছড়ার ভিতরে এ দৃশ্যের এক চমৎকার বর্ণনা পরিস্ফুট। সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের একটা পরিষ্কার ছবি কুমারীদের অন্তরে স্বতঃ জাগ্রত হয়। ব্রতের ছড়ার মধ্যে এ রকম অনেক শিক্ষাই আছে।" এই ব্রতের সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয়টি দেখানো হয়েছে চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিবাহানুষ্ঠানের প্রসঙ্গে। মাধবের কন্যা অপরূপ লাবণ্যবতী তন্বী-বালা চন্দ্রকলা। তাকে দেখে, তার রূপে সূর্য পাগল হয়ে বিয়ে করতে চান। ছড়ায় দেখতে পাই,

"চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া ছিলেন কেশ।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন শাড়ি।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর ফিরেন বাড়ি বাড়ি।।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর বিয়া করতে চায়।।"

সূর্যের মতো এক পাত্র পেলে মাধবের আপত্তি থাকার কথা নয়, তাই সুসম্পন্ন হলো তাদের শুভবিবাহ। সূর্য পেলেন অজস্র দান সামগ্রী। কী নেই তাতে; আর হবেই বা না কেন? মাধব যে লক্ষ্মীপতি। অতএব বিয়ের পর চন্দ্রকলা চললেন পতিগৃহে; আর এখানেই দেখানো হয়েছে বিচ্ছেদ আর মিলনের বেদনা-সুখের আনন্দঘন মুহূর্ত, পল্লী বাংলার চিরায়ত আবেগসঞ্চার। ব্রতিনীদের জীবনেও আসবে এই দিন; মা-বাবা-ভাই-বোন, প্রিয়জন, ক্রীড়াসহচরীদের ছেড়ে যেতে হবে স্বামীগৃহে। আবার মিলনসুখ অপেক্ষা করছে সেখানে, মিলনানন্দের আবেগ, লোকলাজ— সব মিলিয়ে এ এক দুঃখ-সুখের যুগলবন্দি!

মাঘমণ্ডল ব্রতের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিন-অঙ্কে বিভক্ত ব্রতের ছড়ার অসাধারণ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে তিনি লিখছেন, "এই মাঘমণ্ডল-ব্রতের প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে যে সূর্য, যা তাঁকে সেই-রূপেই মানুষে দেখছে এবং বিশ্বাস করছে যে, জলের ছিটায় কুয়াশা ভেঙে দিলে সূর্য-উদয়ের সাহায্য করা হবে। এখানে কামনা হলো সূর্যের অভ্যুদয়। ক্রিয়াটিও হলো কুয়াশা ভেঙে দেওয়া ও সূর্যকে আহ্বান। দ্বিতীয় অংশে চন্দ্রকলাকে দীর্ঘকেশ গোল-খাড়ুয়া-পায়ে একটি মেয়ে এবং সূর্যকে রাজা, বর এবং সেই সঙ্গে সূর্যের মা ও চন্দ্রকলার বাপ কল্পনা করে মানুষের নিজের মনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ির যে-সব ছবি আছে, সূর্যের রূপকের ছলে সেইগুলোকে মূর্তি দিয়ে দেখেছে। তৃতীয় অংশে সূর্যপুত্র বা রায়ের পুত্র রাউল বা লাউল, এক-কথায় বসন্তদেব। টোপরের আকারে এঁর একটি মূর্তি মানুষে গড়েছে, এবং সেটিকে ফুলে সাজিয়ে মাটির পুতুল হালামালার সঙ্গে বিয়ের খেলা খেলেছে। এখানে কল্পনার রাজ্য থেকে একেবারে বাস্তবের রাজ্যে বসন্তকে টেনে এনে, মাটির সঙ্গে এবং ঘরের নিত্যকাজের খুঁটিনাটির মধ্যে ধরে রাখা হলো।"

লাউল বা লালুর বিয়ে করতে যাবার ছড়াটি খুব মনোরম।

"জলের মধ্যে ছিপছিপানী কিসের বাদ্য বাজে,
চান্দের বেটা লাউল্যা আজ বিয়া করতে সাজে।
সাজোরে সাজোরে লাউল্যা সোনার নূপুর দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুইল্যা দিমু বিয়া।"

লাউল বউ নিয়ে আসে; বিয়ের ভোজে সূর্য গামছা মাথায় দিয়ে অন্দরমহলে তদারকি করছেন। 'ঝিকুটি' খেলতে গিয়ে পাওয়া গিয়েছে কিছু টাকা, তা দিয়ে লাউলের বউকে শাঁখা কিনে দেওয়া গেল। রইল কিছু, তা দিয়ে ব্রতিনীর মায়ের শাঁখাও হলো, সব কুমারীরা নিজের মাকে শাঁখা পরান—

"লাউল্যার বউরে শাঁখা দিয়া বেশি হইল টাকা
সেই টাকা দিয়া দিলাম মায়েরে শাঁখা।"

মাটির সঙ্গে সূর্যের ছেলে বসন্তদেব বা লাউলের বিয়ে আর মিলনের পালাও শেষ। ঋতুরাজ পৃথিবীকে ফুলে-ফলে ভরিয়ে বিদায় নিচ্ছেন। তাকে যেতেই হবে, একলাই, আবার শীতের মধ্যে বসন্ত হয়ে ফিরবেন, এখন বিদায়। কিন্তু মেয়েরা বৃথাই তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে—

"কৈ যাওরে লাউল গামছা মুড়ি দিয়া?
তোমার ঘরে ছেইলা হইছে বাজনা জানাও গিয়া।
ধোপা জানাও গিয়া, নাপিত জানাও গিয়া, পরুইত জানাও গিয়া।"

লাউলের ছেলের নাম রাখার অনুষ্ঠান— "লাউলের ঘরে ছেইলা হইছে কি কি নাম-থুমু।/ জল দিয়া জয় নাম থুমু।/ রাজার বেটা রাজার ছেইলা রাজা নাম থুমু।"

কিন্তু লাউলকে যেতেই হবে। মধুমাস শেষ বৈশাখের মেঘ দেখা দিল, মেঘ গর্জন করে উঠলো, ঝড় বইলো, উৎসবের সাজ-সরঞ্জাম লণ্ডভণ্ড করে ভেঙে পড়ল ফুলে-ভরা জইতের ডাল। ঋতুরাজকে বিদায় দিতেই হলো— "আজ যাও লাউল,/ কাল আইসো।/ নিত্য নিত্য দেখা দিও।/ বছর বছর দেখা দিও।"

অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে দেখা যায় মৎস্যজীবী মালো মেয়েরা নিষ্ঠা ভরে মাঘমণ্ডলের ব্রত করছে। মাঘমাসের প্রতিদিন সকালে কুমারী মেয়েরা স্নান করে ভাঁটফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জলে সিঁড়ি পুজো করে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র আওড়ায়। বিবাহের কামনাতেই এই ব্রত। ব্রতের শেষদিন তৈরি হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি, সেই চৌয়ারি মাথায় করে ভাসানো হয় তিতাসের জলে। অক্ষত চৌয়ারির দখল নিতে কিশোরেরা হুল্লোড় করে ওঠে। উঠোন জোড়া আলনার মাঝে কিশোরী ছাতা মেলে বসে, তার মা ছাতার উপর ছড়িয়ে দেয় খই-নাড়ু, আর তা কাড়াকাড়ি করে খায় কিশোরেরা। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

পল ডুসেন : (১৮৪৫-১৯১৯)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মানির বিখ্যাত লেখক, প্রাচ্যবিদ ও গবেষক। তিনি আর্থার শোপেনহাওয়ারের অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য। পরে তিনি শোপেনহাওয়ার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্ধৃতি : বিজ্ঞানের যতই আবিষ্কার হোক না কেন, উপনিষদে প্রতিষ্ঠিত শাশ্বত সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

উৎস : ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুইটি, লেখক— পল ডুসেন।

উদ্ধৃতি : প্রজ্ঞাবৃক্ষের শাখায় উপনিষদ অপেক্ষা সুন্দর পুষ্প এবং বেদান্ত দর্শনশাস্ত্রের অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সুমিষ্ট ফল আর কিছুই হতে পারে না।

উৎস : হিস্ট্রি অব ফিলোসফি, লেখক : পল ডুসেন।

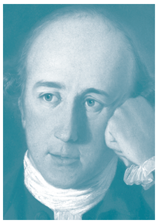

ওয়ারেন হেস্টিংস্ : (১৭৩২-১৮১৮)

পরিচিতি : তিনি ছিলেন পরাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল। তিনি ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি গীতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদের উপর এক সুন্দর ভূমিকা লিখে ছিলেন। ১৭৮৫ সালে ওই পুস্তক রচনা করেন চার্লস উইলকিস। তাঁকে সাহায্য করেন স্যার উলিয়াম জোনস, যিনি কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটির' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উদ্ধৃতি : আমার বলতে দ্বিধা নাই যে সমগ্র মানবজাতির ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতা এমনই একটি ধর্মগ্রন্থ যার মৌলিকত্ব, মাহাত্ম্য, ধ্যানধারণা, ন্যায়বিচার এবং নিপুণ রচনাশৈলী অদ্বিতীয় এবং যার সত্যই কোনও তুলনা পাওয়া যায় না।

উৎস : ইন্ডিয়ান হোরাইজন্স ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস।

উদ্ধৃতি : যখন ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে, যেদিন ব্রিটিশের ঐশ্বর্য আর শক্তির সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়ে যাবে, সেদিনও কিন্তু ভারতের অসামান্য ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের রচয়িতা সেই মহান ঋষিদের কথা সবাই মনে রাখবেন।

উৎস : ইউনিভার্সাল মেসেজ অব দ্য ভগবৎ গীতা— স্বামী রঙ্গনাথানন্দ।

এ. ই. জর্জ রাসেল : (১৮৬৭-১৯৩৫)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন এক বিখ্যাত আইরিশ কবি ও অতীন্দ্রিয়বাদী শিল্পী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আইরিশ রেনেসাঁসের অন্যতম পথিকৃৎ।

উদ্ধৃতি : ভগবদ্গীতা এবং উপনিষদের মধ্যে আছে সমগ্র বিশ্বের জন্য সৃষ্ট এক দৈবিক প্রজ্ঞার পূর্ণজ্ঞান। আমার মনে হয় সেই প্রাচীন লেখক ঋষিরা, তাদের অবিচলিত পূর্বস্মৃতির সাহায্যে এবং প্রগাঢ় প্রজ্ঞার দ্বারা বহু ব্যক্তির সংঘর্ষপূর্ণ বহু জন্মের পূর্বকর্মের বিবরণ অতি নিখুঁত ভাবে রচনা করেছেন। অতি আশ্চর্যের বিষয়, কীভাবে এটা সম্ভব হয়েছে এত নিখুঁত রচনা এত নিশ্চিত ভাবে লেখা।

উৎস : দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া—জওহরলাল নেহরু।

মিহাই এমিনেস্কু : (১৮৫০-৮৯)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন রোমানিয়ার শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তাঁর রচনাগুলি রোমানিয়ার সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি প্রাচীন বৈদিক প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

উদ্ধৃতি : সেখানে বলা হয়েছে, মানুষ আর পক্ষী, চন্দ্র এবং সূর্য— সবার সৃষ্টি এবং লয় হয় ব্রহ্মাতে— সেই পবিত্র পরমপুরুষ যেখানে সমস্ত কিছুই এক হয়ে যায়।

উৎস : তত্ত্বমসি— একটি সুপ্রসিদ্ধ কবিতা, লেখক— মিহাই এমিনেস্কু।

বি.দ্র. : তত্ত্বমসি— একটি সংস্কৃত শব্দ। তাৎপর্য : 'তুমিই সেই'— এই পরম আপ্তবাক্যের অর্থ হচ্ছে 'স্বয়ং'। এর শুদ্ধ, পূর্ণ, মৌলিক ও আদি অবস্থা আংশিক অথবা পূর্ণরূপে পরম সত্যের সঙ্গে অভিন্ন— যা হচ্ছে জগত প্রপঞ্চের উৎসস্থল এবং ভিত্তিভূমি। অন্য কথায়, ব্রহ্ম হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমসত্তা, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর, তিনিই হচ্ছেন অবিনাশী আত্মা, প্রতিটি নশ্বর বা অবিনশ্বর পদার্থের মধ্যেই তিনি স্বয়ং বিরাজমান আছেন। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপী। এটাই হচ্ছে উপনিষদের শিক্ষা। এর উপলব্ধি হচ্ছে স্বজ্ঞালব্ধ। একে কোনও: জাগতিক বিষয় দ্বারা জানা বা উপলব্ধি করা যায় না।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি। সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী, নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

অঙ্গনা

সংস্কৃতি সচেতন

ভারতের ডব্লু ডব্লু ই রেসলার কবিতা দালাল

সুতপা বসাক ভড়

আমরা মেয়েদের ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বাস্তবিক ধারণা করতে পারি না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার প্রমাণ পাই। সেই প্রমাণ আমাদের আশ্চর্যচকিত করে দেয় এবং ওই বিশেষ মেয়েটির জন্য আমরা গৌরবান্বিত হয়ে উঠি। এমনই একটি ঘটনা ঘটে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে, যখন ডব্লু ডব্লু ই (ওয়ার্ল্ড রেসলিং এন্টারটেনমেন্ট)- এর রিংয়ে একজন সালোয়ার কামিজ পরা ভারতীয় মেয়ের দারুণ আবির্ভাব দেখে সম্পূর্ণ বিশ্ব অবাক হয়ে গেছিল। ডব্লু ডব্লু ই-এর রিংয়ে মহিলা পালোয়ানদের পোশাক সম্বন্ধে আমাদের একটু-আধটু ধারণা আছে, কিন্তু হরিয়ানার জিন্দ জেলার মালবী গ্রামের সাধারণ পরিবারের মেয়ে কবিতা দালাল, কী পোশাক পরে রিংয়ে নামবে, সেটা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছিল। এই সাহসিক নির্ণয়ের পেছনে ছিল তার আত্মপ্রত্যয়। শেষ পর্যন্ত নিজের দেশের সংস্কৃতিকেই সে প্রাথমিকতা দিয়েছে।

নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে কবিতা জানিয়েছে তাদের পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি ভালো ছিল না। দুধ বিক্রি করেই সংসার চলত। এরই মধ্যে বড়দাদা সঞ্জয় তাকে খেলাধুলার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। লক্ষ্ণৌয়ে ট্রেনিং ক্যাম্পে থাকাকালীন তার কাছে একবার কোনও টাকা-পয়সা ছিল না। সে যখন একটি মন্দিরে যায়, তখন প্রতিমার সামনে রাখা পনেরো টাকা তুলে নেয় এবং তাই দিয়ে দাঁতের মাজন কেনে। কয়েকদিন পরে মন্দিরে টাকা ফেরত দিতে গিয়ে মন্দিরের বাইরে বসে থাকা ক্ষুধার্ত একটি মেয়েকে খাবার খাইয়ে সে তৃপ্ত হয়।

মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রসঙ্গে কবিতার বক্তব্য— এর জন্য মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। ছোটবেলা থেকেই তাদের আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষা দিতে হবে। সব মেয়ে অবশ্যই পালোয়ান হবে না, কিন্তু বিদ্যালয় স্তরে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই জরুরি। এর ফলে মেয়েদের মধ্যে সাহস জাগবে এবং তারা নির্ভয় হবে।

কবিতা জানিয়েছে যে, সমাজের কট্টরপন্থী মানসিকতার বিরুদ্ধাচারণ করা সোজা নয়। মেয়েদের জন্য কাজটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু আরম্ভ একজনকে করতেই হয়। কবিতা তৃপ্ত যে, এই কাজটা সে করতে পেরেছে। তার সাফল্য আজ সম্মান পাচ্ছে। কবিতার বিশ্বাস ভালো কাজের পরিণাম সর্বদা ভালো হয়।

কবিতা ভারতীয় মেয়েদের পারম্পরিক পোশাক সালোয়ার- কামিজ পরে রিংয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রং বাসন্তী। এই লম্বা-চওড়া সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটি একজন বিদেশিনীকে এমনভাবে ওপরে তুলে রেখেছিল, মনে হয়েছিল যে এইরকম পোশাকের ভারতীয় নারীরা কারুর থেকে কম নয়। তারপর তাকে তুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কট্টরপন্থীদের অর্থহীন নিয়মের বেড়াজালও ভেঙে ফেলেছিল। রিংয়ে সালোয়ার কামিজ পরে নামার ব্যাপারে তার বক্তব্য যে আমাদের দেশের মানুষ নিজেদের সংস্কৃতির ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। রিংয়ে এই দেশীয় পোশাকটি পরার তার অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল, দেশের মেয়েদের কাছে এই খবর দেওয়া যে সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েরাও কারুর থেকে কোনও অংশে কম নয়। তারা তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যকে সম্মান করে এবং নিজস্ব সংস্কার বজায় রেখে এগিয়ে যেতে জানে, এই বিশেষত্বের জন্যই তারা বাকি সবার থেকে আলাদা।

বর্তমান যুগে আমাদের পরিবেশে কিছু নারী-পুরুষ তা সে যে-কোনও বয়সেরই হোন না কেন, পোশাক পরিচ্ছদ নির্বাচন এবং পরিধানের ক্ষেত্রে এমন অবিমৃশ্যতার পরিচয় দেয় যে পারিপার্শ্বিক লোকেদের কাছে তা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই কেবলমাত্র পাশ্চাত্য খোলামেলা পোশাক পরার হুজুগে বিনা প্রয়োজনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে নিজেদের পারম্পরিক পোশাককে তারা অবহেলা করছে। এইসব লোকেদের কবিতা দালালের মতো একটি সাধারণ অথচ সংস্কারিত মেয়ের থেকে শেখা উচিত! ▮

পুস্তক প্রসঙ্গ

মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে এক উন্নতমানের ইতিহাসগ্রন্থ

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

শ্রী বিনয়ভূষণ দাশ প্রণীত ‘পুনশ্চ মুর্শিদাবাদ এবং’ আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও একটি স্বর্ণখণ্ড। সাম্প্রতিককালে লিখিত এত উন্নত মানের ইতিহাস গ্রন্থ চোখে পড়েনি। দেশ পত্রিকায় গ্রন্থালোকে সুশীল চৌধুরীর লেখা ‘নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ’ গ্রন্থ এবং পরে তাঁর একটি চিঠির সূত্র ধরে এই গ্রন্থটির সূচনা। শ্রী চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে এবং চিঠিতে মুর্শিদাবাদের তিনশো বছরের নবাবি আমলকে গৌরবজনক বলে দাবি করেছেন। তাঁর মতে এই তিনশো বছরে মুর্শিদাবাদ শিল্পে, সাহিত্যে, শিক্ষা, প্রজাকল্যাণে উন্নতির শীর্ষে উঠেছিল। ঐতিহাসিক শ্রীদাশ শ্রী চৌধুরীর এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন অজস্র তথ্য সহযোগে। শ্রীদাশ বিশদভাবে দেখিয়েছেন নবাবি আমলে বিশেষত মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল। তাদের মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল, তাদের উপর করের বোঝা ভীষণভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সংস্কৃত শিক্ষার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। শ্রীদাশ এসব তথ্য সমকালীন ইতিহাস থেকে গ্রহণ করেছেন। শ্রী চৌধুরী এই ইতিহাস গ্রন্থগুলি এড়িয়ে গেলেন কী করে? নাকি তাঁর চেষ্টাই ছিল মুসলমান শাসনকালকে স্বর্ণযুগ হিসেব প্রতিপন্ন করা? মুসলমান শাসনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চরমে পৌঁছেছিল এটা দেখানো কি একটা রেওয়াজ? এ কাজ তো বামপন্থী ঐতিহাসিকরা করে থাকেন। লেখক কি সে দলের?

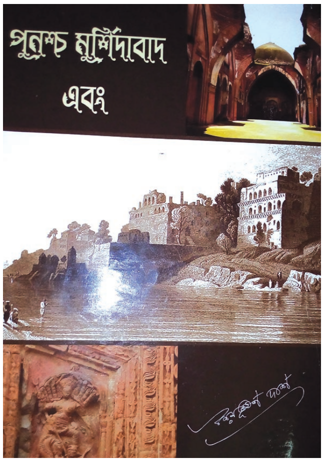

শ্রী চৌধুরী বলেছেন, মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা হয় ১৭০৪ সালে। শ্রীদাশ দেখিয়েছেন তাঁর এই বক্তব্য মনগড়া। মুর্শিদাবাদ নিয়ে অজস্র উর্দু ফারসি বাংলা ইংরেজি ভাষায় ইতিহাস লিখিত হয়েছে। ১৭০৪ সাল যে মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা বছর একথা কোথাও উল্লেখ নেই। এটা দুঃখের বিষয় একজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ভালো করে ইতিহাস চর্চা না করে এমন মনগড়া সিদ্ধান্ত নিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁন তাঁর দেওয়ানি কেন্দ্র ঢাকা থেকে ১৭০৪ সালে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করার বহু আগে থেকেই মুর্শিদাবাদের অস্তিত্ব ছিল। তখন এ জায়গার নাম ছিল মুখসুদাবাদ বা মুখসুসাবাদ।

বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব হবার পর মুর্শিদকুলি খান এই এলাকাটি তাঁর নামে রাখেন। অতএব ১৭০৪ সালে মুর্শিদাবাদ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শ্রী চৌধুরীর এ যুক্তি ধোপে টেকে না। শ্রীদাশ দেখিয়েছেন ঔরংজেবকে খুশি করার জন্য মুর্শিদকুলি খান প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা পাঠাতেন মুর্শিদাবাদের মানুষকে করভারে জর্জরিত করে। শ্রী চৌধুরীর গ্রন্থে কোথাও তার উল্লেখ নেই।

শ্রীদাশ আরেকটা বড় কাজ করেছেন। ‘মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি : সাভারকর, মার্কস এবং দুই রাজন্য’ অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের দুই প্রধান ইতিহাসকার কার্ল মার্কস ও সাভারকর দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। মার্কস তাঁর গ্রন্থ লিখেছিলেন লন্ডনে বসে। এটা ছিল কতকগুলি রিপোর্টের সমষ্টি। যা তিনি আমেরিকার একটি পত্রিকায় নিয়মিত পাঠিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে গবেষণার ছাপ ছিল না। তিনি ইংরেজদের পাঠানো তথ্য থেকে রিপোর্টগুলি তৈরি করেছিলেন। তাঁর রিপোর্টিংয়ে নানাসাহেব ছাড়া আর কোনও স্বাধীনতাকামীর নাম পাওয়া যায় না। অথচ মার্কসবাদীরা কথায় কথায় এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেন। অপরপক্ষে মহাবিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম’ হিসেবে যিনি দেশের সামনে তুলে ধরেন, তিনি বীর সাভারকর। তিনিও ইংল্যান্ডে বসে অজস্র তথ্যের ভিত্তিতে এই ইতিহাস রচনা করেন যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের ছোটবড় নায়কদের কথা উল্লিখিত আছে। মার্কস এদের কখনও বিপ্লবী বা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে উল্লেখ করেননি। এই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করে শ্রীদাশ একটি বড় কাজ করেছেন। লেখক শ্রীদাশ ঠিকই বলেছেন, মার্কসবাদী ও আলিগড় ঐতিহাসিকরা সাভারকরের ইতিহাসকে চেপে দেওয়ার জন্য মার্কসের মন্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রসঙ্গত লেখক জানিয়েছেন, এই স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান নেতারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে মহাবিদ্রোহের সময়ই হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করেছিলেন। শেষ কথা— লেখক একটি নতুন তথ্য আমাদের দিয়েছেন। তাঁর মতে মহাবিদ্রোহের সূচনা ব্যারাকপুরে হয়নি, হয়েছিল মুর্শিদাবাদে এবং তিনি বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। শ্রীদাসের গ্রন্থটি পড়তে পড়তে মনে হয় সাম্প্রতিককালে লিখিত এত উন্নত মানের ইতিহাস গ্রন্থ চোখে পড়েনি। দেশ পত্রিকায় গ্রন্থালোকে সুশীল চৌধুরীর মতো খ্যাতিমান ঐতিহাসিকেরা কীভাবে ইতিহাস বিকৃত করছেন ভেবে দুঃখ লাগে। লেখক শ্রীদাশকে সাধুবাদ দিতে হয় এই জন্য যে, তিনি ইতিহাস লেখার নামে বাম ঐতিহাসিকদের জঘন্য অপপ্রচারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। লেখককে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাঁকে অনুরোধ করি তিনি যেন আরও উন্নত মানের ইতিহাস গ্রন্থ আমাদের উপহার দেন। মুদ্রণ ও বাঁধাই চমৎকার।

পুনশ্চ মুর্শিদাবাদ এবং : লেখক— বিনয় ভূষণ দাশ। পরিবেশক : পুস্তক বিপণী, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ : ২০১৮। মূল্য : ১০০ টাকা।

সাক্ষাৎকার

নাগা সমস্যার আশু সমাধানের জন্য বিজেপি দায়বদ্ধ : রামমাধব

ত্রিপুরা এবং নাগাল্যান্ডের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক রামমাধবের একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রতি টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এবারের স্বস্তিকায় থাকল তার বাংলা অনুবাদ। —স. স্ব

□ নাগাল্যান্ডে ভোট বয়কটের ডাক শোনা যাচ্ছিল। এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে মনে করছেন?

● **রামমাধব** : আমার মনে হয়, নাগা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সকলেই ভেবেছিলেন এবার খুব তাড়াতাড়ি সব ঠিক হয়ে যাবে। বলতে পারেন সর্বস্তরের মানুষের মনে একটা আশা তৈরি হয়েছে। মানুষ চাইছেন চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়িত হোক। বিজেপির পক্ষ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি আমি দিতে চাই, নাগা সমস্যার আশু সমাধানের জন্য আমরা দায়বদ্ধ। চুক্তি যাতে দ্রুত বাস্তবায়িত হয় ক্ষমতায় এলে আমরা সেটা দেখব।

নাগরিক সমাজের নেতাদের এই কথাটাই আমরা বারবার বলছি। বলতে ভালো লাগছে, ভারতের নাগরিক হিসেবে নির্বাচন-সহ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের যে সমান শ্রদ্ধাশীল থাকা দরকার, সেটা তারা বুঝেছেন। সেই সঙ্গে এও বুঝেছেন বিজেপি দ্রুত সমাধান চায়। ঝুলিয়ে রাখার রাজনীতিতে বিজেপি বিশ্বাস করে না।

□ আপনি বারবার দ্রুত সমাধান করার কথা বলছেন। কোনও ডেডলাইন কি ঠিক করা আছে যার মধ্যে কাজ শেষ করতে চান?

● **রামমাধব** : না, আমি কোনও ডেডলাইনের কথা বলছি না। বলতে চাইছি ইতিমধ্যেই বেশ কিছু কাজ হয়েছে। আমরা সেখানে থেকেই শুরু করব। পিছনে ফিরে যাব না। কয়েকটি এমন ইস্যু রয়েছে যার সমাধান যত দ্রুত সম্ভব করা দরকার। মনে হয় আমরা তা করেও ফেলব।

□ নাগা শান্তিচুক্তি নিয়ে প্রকাশ্যে কিছুই বলা হয়নি। নাগাদের প্রধান দাবি ছিল বৃহত্তর নাগাল্যান্ড বা নাগালিম গঠন। এই শর্ত কি মেনে নেওয়া হয়েছে?

● **রামমাধব** : চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বিভিন্ন নাগা গোষ্ঠী এবং ভারত সরকারের মধ্যে। চুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষের মতামত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। আমার অনুরোধ কেউ ভয় পাবেন না। সকলের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

□ অন্য রাজ্যগুলিকেও কি আলোচনায় ডাকবেন?

● **রামমাধব** : যদি এরকম কোনও বিষয় থাকে যেখানে অন্য রাজ্যের বক্তব্য শোনা প্রয়োজন, আমি নিশ্চিত, সরকার সেক্ষেত্রে তাদের ডাকবে।

□ খসড়া চুক্তি অনুযায়ী কাজ কতটা এগোল?

● **রামমাধব** : খসড়া চুক্তি একটা কাঠামো মাত্র। উভয়পক্ষের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে তার ভিত্তিতে তৈরি। এটা ফাইনাল এগ্রিমেন্ট নয়। একে ভিত বলতে পারেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষ— সরকার এবং নাগাগোষ্ঠীগুলির মধ্যে

বোঝাপড়া বেড়েছে। বিশ্বাসের একটা জায়গা তৈরি হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর গত আড়াই বছরে আমরা তার একাধিক প্রমাণ পেয়েছি।

সত্যি কথা বলতে কী, নাগা গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সন্ত্রাস বিরোধী আলোচনা শুরু হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে। সন্ত্রাস বন্ধ করে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য তিনি নাগা গোষ্ঠীগুলিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ২০০৪-এর নির্বাচনে আমরা হেরে যাই। তারপর ১০ বছরের ইউপিএ আমলে সব কিছু ধামাচাপা পড়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর দ্রুত সমাধানসূত্র বের করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নেবার ফলেই আর. এন. রবিকে দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তারপর দুইপক্ষ আবার আলোচনার টেবিলে বসল। খসড়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো কয়েক মাসের মধ্যে। এই খসড়া চুক্তি আমাদের সকলের সক্রিয় ইচ্ছার ফসল। এটা একটা এক পাতার ডকুমেন্ট। বিস্তারিত কিছু নেই। প্রতিটি বিষয় সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি-সহ আপাতত আলোচনাধীন। সুতরাং এখনই এই নিয়ে কিছু বলা আমার উচিত হবে না।

□ নাগাল্যান্ডের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা কতটা?

● রামমাধব : আমার তো মনে হচ্ছে নাগাল্যান্ডের পরবর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হবে বিজেপি। প্রার্থীরা সকলেই জিতবেন।

□ গোহত্যা নিবারণ ইত্যাদি কিছু আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সারা দেশে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে একটা ভাবমূর্তি রয়েছে। নাগাল্যান্ডে এই ভাবমূর্তির কী ব্যাখ্যা দিচ্ছে বিজেপি?

● রামমাধব : নাগাল্যান্ডে আমরা বরাবর মানুষের সমর্থন পেয়েছি। ২০০৮ সালে নাগাল্যান্ড বিধানসভায় আমাদের আটজন বিধায়ক ছিলেন। সর্বশেষ বিধানসভায় ছিলেন চারজন। সুতরাং এখানে বিজেপির সমর্থন রয়েছে। এর কারণ নাগাল্যান্ডের মানুষ বোঝেন আমাদের বৃহত্তর লক্ষ্য হলো উন্নয়ন। যার পোশাকি নাম, সব কা সাথ সব কা বিকাশ। এবারের নির্বাচনেও বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তিনটি রাজ্যে শান্তি স্থাপন, উন্নয়ন এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত সরকার মানুষকে উপহার দেওয়া। সাধারণ মানুষও এইগুলোই চান।

□ নাগাল্যান্ডের বিদায়ী সরকারের অংশীদার ছিল বিজেপি। তা হলে তখন কেন আপনারা এইসব বিষয়ে ভাবেননি?

● রামমাধব : আগের সরকারে আমরা ছিলাম দুর্বল অংশীদার। আমাদের বিধায়ক ছিলেন চারজন। শক্তিশালী বিজেপি যদি সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করে তা হলে আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির রূপায়ণ সহজতর হবে।

□ নাগাল্যান্ডে আপনারা যদি এতই শক্তিশালী হন, তাহলে নিজেদের শক্তিতে সরকার গঠন করছেন না কেন?

● রামমাধব : আমরা মনে করি নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্যে প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব আবেগকে সম্মান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে আমাদের শক্তিশালী জনসমর্থন রয়েছে। কিন্তু একটি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে স্থানীয় মানুষের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাজটিও সহজ হয়ে ওঠে।

□ কংগ্রেস সম্বন্ধে কী বলবেন?

● রামমাধব : নাগ্যাল্যান্ডে কংগ্রেস আর আলোচনা করার মতো দল নয়। বস্তুত এই রাজ্যে কংগ্রেস দুটি আঞ্চলিক দলে পরিণত হয়েছে। একটি এন পি এফ অন্যটি এন ডি পি পি তৃতীয় দল বিজেপি, যাদের জেতার মতো যথেষ্ট জনসমর্থন রয়েছে। ■

অশান্ত নাগাল্যান্ড

১৮৮১ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণের ফলে বিদেশি শাসকের অধীনস্থ হবার আগে নাগাল্যান্ড ছিল স্বাধীন। ১৯৪৭ সালে ভারতের মতো নাগাল্যান্ডও স্বাধীন হয়। তার আগে ১৯২৯ সালের ১০ জানুয়ারি নাগা নেতারা জানিয়েছিলেন তারা চান না নাগাল্যান্ড ভারতের অঙ্গরাজ্য হোক। ভারত স্বাধীন হবার একদিন আগে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে নাগাল্যান্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পরে নাগাল্যান্ডকে তার অঙ্গরাজ্য ঘোষণা করে। ১৯৫১ সালের ১৬ মে নাগা সার্বভৌমত্বের বিষয়টি নতুন করে উত্থাপন করা হয়। ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (খাপলাং) সমগ্র নাগা পাহাড়কে এক পতাকার নীচে এনে স্বাধীন সার্বভৌম বৃহত্তর নাগাল্যান্ড (নাগালিম) গঠনের কথা ঘোষণা করে। এই নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে নাগাল্যান্ডের বিরোধ। দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ফলে রাজ্যটি যথেষ্টই পিছিয়ে পড়ে। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রথম বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। এখন সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী।

এক বালিকাবধূর স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই

ড. কীর্তি ভারতীর সঙ্গে পিংকি তনওয়ার।

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাঙালি মেয়েদের ভাগ্য একদিক থেকে বেশ ভালো। কারণ এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামের এক মহীরুহের জন্ম হয়েছিল। মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার ফল বাঙালি মেয়েরা যতটা পেয়েছেন ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মেয়েরা ততটা পাননি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত সংগঠন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি দেশের নানা প্রান্তে এ ব্যাপারে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বাল্যবিবাহের সংখ্যা অনেকাংশে কমানোও গেছে। কিন্তু বন্ধ করা যায়নি।

বাল্যবিবাহের শিকার এমনই এক বালিকাবধূ পিংকি তনওয়ার। মাত্র দশ বছর বয়েসে তার বিয়ে হয়েছিল রাজস্থানের আলওয়ার জেলার থানাগাজির বাসিন্দা হিমন্ত সিংহের সঙ্গে। এই বিয়েতে তার মত ছিল কিনা এ প্রশ্ন তোলা অবান্তর। বিয়ের পর দিন থেকে হিমন্ত সিংহ দলবল নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হামলা করত। তার দাবি, এখনই গাওনা করিয়ে পিংকিকে তার সঙ্গে পাঠাতে হবে। পিংকির দিন কাটত নিদারুণ আতঙ্কে। কিন্তু তার কথা শোনার মতো মন মা ছাড়া আর কারোর ছিল না।

এখানে গাওনা প্রসঙ্গে দু-এক কথা বলা দরকার। সমগ্র উত্তর ভারতে এই প্রথাটি খুবই জনপ্রিয়। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে সাধারণত বাচ্চা মেয়েরা বাবা-মার কাছেই থাকে। গাওনা হবার পর তারা শ্বশুরবাড়িতে যায়। বিয়ে আর গাওনার মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকে। যার মধ্যে বাচ্চা মেয়েটি নিজের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে অথবা তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করানো হয়। পিংকির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। সে প্রথম থেকেই শ্বশুরবাড়িতে যেতে চায়নি। তাই তার ওপর শুরু হয় মানসিক অত্যাচার। এমনকী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা একবার তাকে অপহরণের চেষ্টাও করেছিল।

এই ঘটনার পর পিংকির জীবন এক অদ্ভুত খাতে বইতে শুরু করল। একটি বাচ্চা মেয়ে, যার তখন আক্ষরিক অর্থেই পুতুল খেলার বয়েস। এক্কা-দোক্কার দাগ টানা পৃথিবীতে পা ফেলার মেয়েবেলায় জীবন তাকে দিল অন্য পাঠ। কীভাবে তথাকথিত প্রিয়জনদের হাত থেকে বাঁচতে হয়, শিখতে হলো তাকে। শ্বশুরবাড়ি নামক বন্দিশালা থেকে পালাতে গিয়ে শৈশবটাই খসে পড়ল তার হাত থেকে।

ভাগ্য ভালো মা পাশে ছিলেন। মীরাদেবী আগেই সারথি ট্রাস্টের নাম শুনেছিলেন। সারথি বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েদের জন্য কাজ করে। তাদের অবৈধ বিবাহের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব বিয়ে আদালত বাতিল করে দেয়। মীরা দেবী যোগাযোগ করলেন সারথির সঙ্গে। মেয়েকে বড়ো করার জন্য তিনি অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোনও সন্দেহ নেই এই সিদ্ধান্তটি তাদের মধ্যে সব থেকে সেরা।

সারথির ম্যানেজিং ট্রাস্টি ড. কীর্তি ভারতী পিংকিকে যোধপুরে আসতে বললেন। সেখানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে শুরু হলো তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। হিমন্তের সঙ্গে তার বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য পিংকি আদালতের কাছে আবেদন করল। ড. কীর্তি ভারতী স্বয়ং তার হয়ে মামলা লড়লেন। অতি সম্প্রতি আদালত তার পক্ষে রায় দিয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে, জোর করে পিংকির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই এই বিয়ে অবৈধ।

আদালতের রায়ে উচ্ছ্বসিত সারথি ট্রাস্ট। ড. কীর্তি ভারতী বলেন, 'আমরা চাই বাচ্চারা বাল্যবিবাহের হাতকড়া খুলে স্বাধীন জীবনযাপন করুক। যেসব বাচ্চারা এখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে আমরা তাদের প্রত্যেকের পাশে দাঁড়াতে চাই।' উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত সারথি ৩০টি বাচ্চাকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। ৯ জনের বিবাহ সংক্রান্ত মামলা আদালতে বিচারাধীন।

পিংকি তনওয়ার এখন স্বাধীন। যদিও এখন আর তাকে বাচ্চা মেয়ে বলা যাবে না। বিয়ের পর দশ বছর কেটে গেছে। কুড়ি বছরের যুবতীকে বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলে তার চোখে অদ্ভুত এক ছায়া ঘনায়। বোঝা যায়, ক্ষতস্থান নতুন চামড়ার নীচে ঢাকা পড়লেও ক্ষতচিহ্নকে লুকোতে পারেনি। ওটা জন্মদাগের মতো থেকে যাবে। কিন্তু পিংকি এসব তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে চান। ভয়ের জীবনটা পিছনে ফেলে দেখতে চান স্বপ্ন। বিএ পাশ করেছেন। বিএড পড়ছেন।

জীবনে কী হতে চান? প্রশ্ন শুনে পিংকির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মাথানীচু করে লাজুক ভঙ্গিতে বলেন, 'আমি পড়াতে চাই। বাচ্চাদের পড়াতে আমার খুব ভালো লাগে।'∎

‘খেলো ইন্ডিয়া’ই দেশের ভবিষ্যৎ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

‘খেলো ইন্ডিয়া’-তে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা।

বিশ্বখ্যাত শুটার রাজ্যবর্ধন সিংহরাঠোর ভারতের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী হয়েই দেশের ক্রীড়াসংস্কৃতির অভিমুখটা বদলে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। দেশের প্রতিটি স্কুলে খেলা ও শরীরচর্চাকে ফিরিয়ে আনতে সরকারিভাবে গ্রহণযোগ্য ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছেন। আর সেই খসড়ার সূত্র ধরেই দেশ জুড়ে স্কুল পর্যায়ের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বৈপ্লবিক ‘খেলো ইন্ডিয়া’ কর্মসূচি সম্প্রতি সম্পন্ন হলো দিল্লিতে। প্রতি বছর এধরনের অনুষ্ঠান হবে যার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কৃতবিদ্য ক্রীড়াবিদ ও অ্যাথলিট উঠে আসবেন। ‘ক্যাচ দেম ইয়ং’ বা ‘গ্রাস রুট লেভেল কোয়ালিটি সার্চআউট’— এই মানসিকতা ও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলে ভারতের ক্রীড়াসংস্কৃতির পরিবেশ ও পরিকাঠামোটাই সংস্কারিত হবে। এশিয় ও বিশ্বপর্যায়ের ইভেন্ট থেকে সাফল্য ও গৌরব করায়ত্ত হবে যা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সহায়ক হবে। আজকে বিশ্বের প্রতিটি উন্নত দেশ গলফ, ফর্মুলা ওয়ান কার রেসিং, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে চরম সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এই বোধটা এখনো এদেশের ক্রীড়াসংগঠক এবং অন্তসারশূন্য রাজনীতিকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি, এটাই দুর্ভাগ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্যতিক্রমী চরিত্র আর তার সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যবর্ধন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব এবং ফৌজি কর্নেল হওয়ার সুবাদে খেলা ও শরীরচর্চার গুরুত্ব বোঝেন। তাই মন্ত্রী হয়েই স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন দেশের প্রকৃত ভিআইপি হচ্ছে আন্তর্জাতিক পদকজয়ী ক্রীড়াবিদ ও অ্যাথলিটরা। রাজনীতিকরা অতি সাধারণ মানুষ। তারা আজ আছেন, কাল নেই। সেই কথার প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের ক্রীড়াবৃত্তে নতুন সংযোজন এই ‘খেলো ইন্ডিয়া’ প্রজেক্ট, যা দিল্লির মূল স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে যাত্রা শুরু করে। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মোদী আহ্বান করেন দেশের কিশোর-তরুণ প্রজন্ম যেন লেখাপড়ার মতো খেলা ও আনুষঙ্গিক শারীরবৃত্তিয় কাজকে অন্তর থেকে গ্রহণ করে এবং নিরলসভাবে তার অনুশীলন করে যা সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের চালিকাশক্তি। দেশের বিভিন্ন খেলার কীর্তিমান পুরুষ ও মহিলা অ্যাথলিট, ক্রীড়াবিদরা এই অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ছিলেন সব রাজ্য থেকে আসা প্রতিযোগীদের অভিভাবকরাও।

সাতদিন ধরে চলা এই প্রতিযোগিতা ক্রীড়াশৈলী ও উৎকর্ষের দিক থেকে বিশ্বের যে কোনও উন্নতিশীল দেশের মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনীয়— এই ধারণা পোষণ করেন অনুষ্ঠানে হাজির থাকা তিন অতি বিখ্যাত তারকা— সর্দার সিংহ, শচীন তেন্ডুলকর ও অঞ্জলি ভাগবত। এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তাঁরা এবং অন্য তারকা খেলোয়াড় ও কোচেরাও অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যবর্ধন সিংহের। দীর্ঘকালীন ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এই প্রকল্পের কাজ যদি দেশের প্রত্যন্তে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে ভারত বিশ্ববৃত্তে বৃহৎশক্তি হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে বলে তাদের ধারণা।

‘অনূর্ধ্ব ১৭’ বয়সভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় সব মিলিয়ে জলে স্থলে ১৫টি ইভেন্টে বেশ বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে পঞ্জাব, মণিপুর, মহারাষ্ট্রের ছেলে-মেয়েদের পারফরমেন্স দেখে বোঝা গেছে এই তিনটি রাজ্যে প্রতিটি সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলে খেলা-ব্যায়াম, শরীরচর্চাকে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে চর্চা করানো হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। জাতীয় ‘সিনিয়র স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস’-এ তাই এই তিন রাজ্যই অর্ধেকের বেশি পদক পায়। অল্পবয়স থেকেই ভালো পরিকাঠামো, খাওয়া-দাওয়া, পারিপার্শ্বিক সুযোগ সুবিধে পায় এই তিন রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা। তবে এই সুযোগ-সুবিধে ও ভবিষ্যৎ সামাজিক সুরক্ষার আশ্বাস প্রদান ধ্বনিত হয়েছে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে। তার জন্য দেশের প্রতিটি খেলার সর্বভারতীয় সংস্থা ও সরকারি সংস্থা সাই একযোগে কাজ করবে বলে পিএমও ও ক্রীড়ামন্ত্রক থেকে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাব যাতে গত সত্তর বছরে নেওয়া অগুন্তি প্রস্তাবের মতো ‘ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে স্থান না পায় তা দেখাও কিন্তু কর্তব্য মন্ত্রী মহোদয়ের। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের হাতেগড়া বিশ্বজনীন দুই প্রতিষ্ঠানে সব কাজকর্মের সংবিধান ও পরিকল্পনা করে দিয়ে গেছেন তা অনুসরণ করতে পারলেই সরকারি সব উদ্যোগ সফল হবে। ■

মনীষী কথা

নবাঙ্কুর

১২৫ তম জন্মবর্ষে
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৮৯৪ সালের জানুয়ারি। উত্তর কলকাতার ঈশ্বর মিল লেনে জন্মেছিলেন শতাব্দীর সেরা বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ২০১২ সালে বিজ্ঞানী হিগস 'বোসন'-এর আবিষ্কারের পর সত্যেন্দ্রনাথের নামটি আরও সামনে চলে আসে। ১৯৩৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই কলকাতা থেকে তাঁর দুই গবেষণাপত্র পাঠান অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে। পরবর্তীকালে আইনস্টাইন অনুবাদ করে ওই গবেষণাপত্র দু'টি প্রকাশ করেন। এরপর থেকেই পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইনের সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম।

ভারতীয় হিসাবে গর্বের বিষয় এই জগতের মৌল কণার অর্ধেকই তাঁর নামের অনুসারী। 'বোসন' যার পরিভাষা। 'বোসন'-এর পাশাপাশি কণা পদার্থবিদ্যায় একাধিক জায়গায় তাঁর পদবি 'বোস' জায়গা করে নিয়েছে। এখন দেশ-বিদেশের পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গবেষণার অঙ্গ 'বোস সংখ্যান'। ১৯৪৮ সালের ২৫ জানুয়ারি নিজে প্রতিষ্ঠা করলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয়, তিনি শুধু পরিষদের মূল স্থপতি ছিলেন না, প্রতিষ্ঠা বর্ষ থেকে আমৃত্যু পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সবথেকে বড় পরিচয় জন্মলগ্ন থেকে এখনও বাংলায় মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ করা। টানা ৭০ বছর ধরে অবিচ্ছেদ্যভাবে পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্ব রেখেছে পরিষদ।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু'র জন্মসাল অনুসারে এবছর তাঁর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী। আর সেই উপলক্ষে গত ১ জানুয়ারি নয়াদিল্লির 'বিজ্ঞান ভবন' থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মজয়ন্তী পালনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কলকাতার সল্টলেকের সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে মোদী এই অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন। একই সঙ্গে পরিষদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সত্যেন বসুর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালন করবে মৌল বিজ্ঞান। ওই কেন্দ্রের মুখ্য অধিকর্তা সমিত কুমার রায় জানিয়েছেন, ২০১৮ সাল জুড়ে নামিদামি বিজ্ঞানীদের নিয়ে আলোচনা সভা এবং জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে নোবেলজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানীদেরও বক্তৃতা দেওয়ার কথা রয়েছে।

শুধু বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনে আচার্যের গভীর চর্চা এবং ব্যুৎপত্তি ছুঁয়েছিল। শিল্পকলা, সঙ্গীত জগতেও ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীতে উচ্চমানের রসগ্রাহী এবং সুদক্ষ এস্রাজ বাদক বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একমাত্র বিজ্ঞান গ্রন্থ 'বিশ্ব পরিচয়' বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকেই উৎসর্গ করেছিলেন। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো, জাতীয় অধ্যাপক, দেশিকোত্তম, পদ্মবিভূষণের মতো একাধিক সম্মান পেয়েছেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিশ্বভারতীর উপাচার্যও ছিলেন তিনি। জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার উপদেষ্টা পদেও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছিলেন তিনি। পরিষদের কর্মসচিব তপন সাহা জানিয়েছেন, এবছর 'সত্যেন্দ্রনাথ জীবন ও কর্ম' বিষয়ে বিশিষ্টজনের লেখা নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা আগামী মে মাসের সংখ্যাটি তাদের প্রতিষ্ঠাপুরুষ সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেই প্রকাশ করবে।

জানুয়ারি মাসের ১৩ তারিখে বিজ্ঞানাচার্যের ১২৫তম জন্মবর্ষের অনুষ্ঠান হয়েছে কলকাতার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমিতে। ওই দিনই সন্ধ্যায় সল্টলেকের সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে আচার্যকে নিয়ে বক্তৃতা দিলেন ন্যানো বিজ্ঞনের পুরোধা ভারতরত্ন অধ্যাপক সিএনআর রাও।

সন্দীপ বসু

ভারতের পথে পথে

কুলিক পাখিরালয়

রায়গঞ্জ শহর বাঁদিকে রেখে শিলিগুড়ির দিকে জাতীয় সড়ক ধরে সামান্য যেতে মহানন্দার শাখা কুলিক নদীর পাড়ে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কুলিক পাখিরালয়। জুলাই থেকে অক্টোবরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি এসে রায়গঞ্জ ঝিলে আশ্রয় নিয়ে বাসা তৈরি করে জাতীয় সড়ক লাগোয়া অর্জুন, সেগুন, পাকুড় প্রভৃতি বড় বড় গাছে। বিশাল ঝিলে দোয়েল, কোয়েল, বুলবুলির সঙ্গে শামুকখোল, নাইট হেরন, ওয়াকার প্রভৃতি পারিযায়ী পাখি এখানে দেখা যায়। রংবেরংয়ের পাখির ডানায় আকাশও ঢাকা পড়ে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পায় কুলিক পাখিরালয়। সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে।

জানো কি?

- সংস্কৃত ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ রয়েছে।
- কম্পিউটার সফটওয়্যারের জন্য সংস্কৃত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ভাষা।
- অন্য ভাষার তুলনায় সংস্কৃতে কম শব্দে বাক্য পূর্ণ করা যায়।
- কর্ণাটকের মুত্তুরু গ্রামের সমস্ত মানুষ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন।
- জার্মানির ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয়।
- নাসার মতে, অন্তরীক্ষ থেকে পৃথিবীতে শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষা স্পষ্ট রূপে আসে।
- নাসায় রক্ষিত ৬০ হাজার সংস্কৃত ভাষার ভূর্জপত্রের গবেষণা চলছে।

ভালো কথা

একটি আনন্দের মুহূর্ত

একদিন স্কুলের উদ্দেশে বাস ধরব বলে মায়ের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। মা আমাকে এক বোতল ফলের রস কিনে দিল। আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম। কারণ মা রাস্তায় সহজে এসব কিনে দেয় না। বাসে একটু একটু করে খাব বলে সযত্নে বোতলটি ব্যাগে পুরলাম। বাসে প্রচণ্ড ভিড়, বসার জায়গা পেলাম না। তাই ফলের রস খাওয়ার আর কোনও উপায় নেই। শিয়ালদার কাছে এসে মা-আমি দুজনে বসার জায়গা পেলাম। খুশি খুশি মনে বোতলের ছিপি খুলে তৃপ্তি ভরে এক ঢোক ফলের রস খেলাম। তখন দুটি আমার বয়সি ছেলে পাথর বাজাতে বাজাতে বাসে উঠে গান গাইতে লাগলো। সবার কাছে তারা পয়সা চাইছে, কেউ দিচ্ছে কেউ দিচ্ছে, না। কেউ আবার ভিক্ষে না করে পড়াশুনা করার উপদেশ দিল। মায়ের কাছে পয়সা চাইতেই মা ওদেরকে বাদাম আর লজেন্স কিনে দিল। দু'জনে খুশি হয়ে নেমে যেতে যেতে আমার কাছে ফলের রসের বোতলটি লোভনীয় ভাবে দেখতে লাগল। আমি কী করব ভেবে মায়ের দিকে দিকে তাকালাম। দেওয়া না দেওয়ার সিদ্ধান্তটি মা আমার উপরই ছেলে দিল। তখন আমি বোতলটা ওদের দিকে এগিয়ে দিলাম। ওরা খুশি মনে বাস থেকে নেমে গেল। আমারও মন খুশিতে ভরে উঠল।

অর্ঘ্যদীপ আঢ্য, পঞ্চম শ্রেণী, সিমলা, কলকাতা-৬

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) স রা ন ম মা রি চ

(২) ণ যে রে ন কা তে প্র

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ণি ম রো শি ল কু ঘু র

(২) ণ য় রা প র্য চ ন্ধ ব্র

৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) ব্যায়ামশালা (২) ভাগ্যবিধাতা

৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) মোহনভোগ (২) যোগসাধনা

উত্তরদাতার নাম

(১) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, বর্ধমান। (২) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা। (৩) শুভম্ সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া। (৪) উদয়ন সাহা, সরকারপাড়া, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

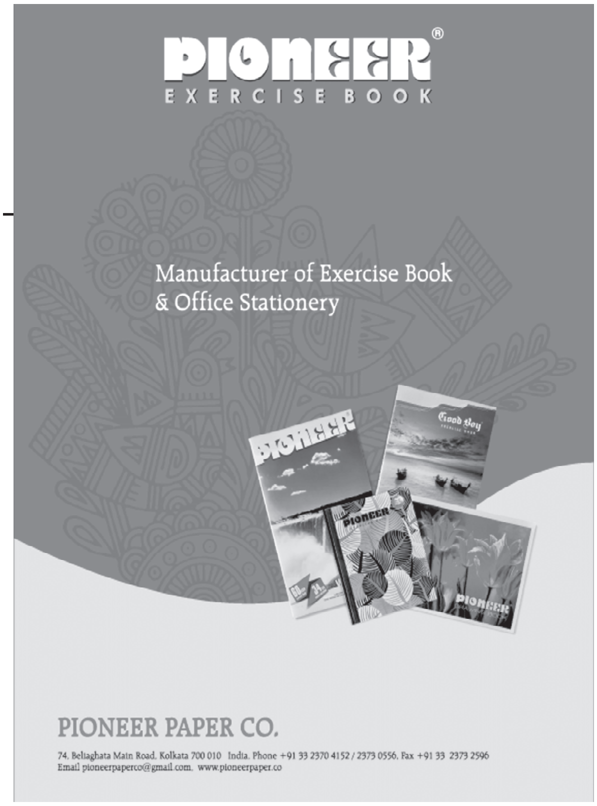

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

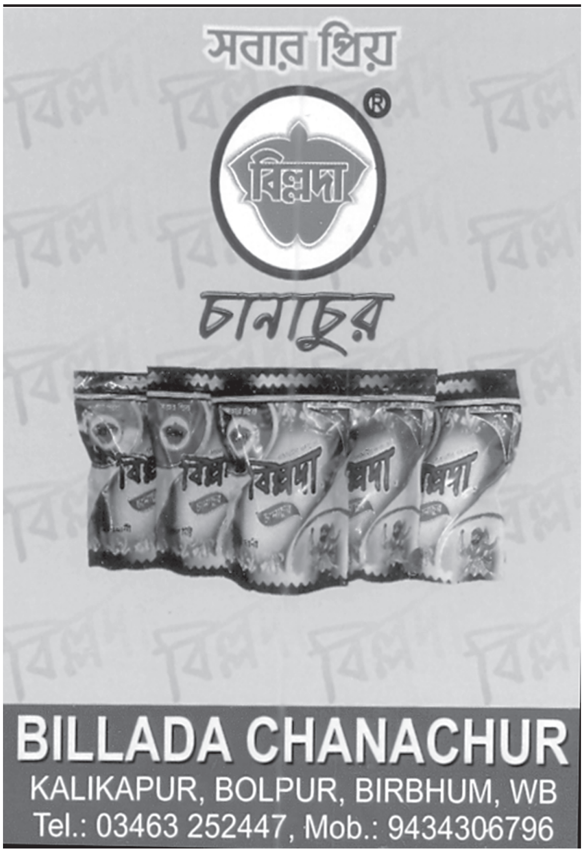

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
19 February - 2018 - Rs. 10.00

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।